

শ্রীশিশির সেনগুপ্ত

ও

শ্রীজয়ন্ত কুমার ভাদুড়ী

দেশবন্ধু বুক ডিপো

৫৪-এ, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—১৩৫২

প্রকাশক
শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
দেশবন্ধু বুক ডিপো
৫৪-এ, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

প্রচ্ছদপট ও রূপায়ন
লক্ষ্মী দাস

মুদ্রাকর
শ্রীকালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৬, চাল্‌তাবাগান লেন, কলিকাতা

দাম—আড়াই টাকা

বিনয় ঘোষ

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

কোজাগরী পূর্ণিমা
১৩৫২
কলিকাতা

এই লেখকদের অন্যান্য লেখা—

গ্রেট হাঙ্গার (২য় সংস্করণ)

পাওয়ার অফ্ এ লাই

—যোয়ান বয়ার

কমরেড কিসলিয়াকফ

—রোমানফ

পোর্ট্রেট

—পার্ল বাক

শিশির সেনগুপ্ত

সূর্য্য তপস্যা

প্রাগ্‌বাক

বৃহত্তর বিশ্বের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের ছবি এত বিরাট ও বৈচিত্র্যপূর্ণ যে তার পরিপ্রেক্ষণীকে সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করা সহজসাধ্য কাজ নয়। কবিগুরু ভিন্ন আর কোন সমসাময়িক এশিয়াবাসী এত বিপুল সময় ব্যেপে সমগ্র পৃথিবীর জনমতে গভীরভাবে নাড়া দেননি'। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক মল্লভূমিতে এবং ধর্মের লোকে—সর্বত্রই কবিগুরু নিজের বিরাট প্রতিভার অনস্বীকার্য দান দিয়ে গেছেন। এক কথায় রবীন্দ্রনাথের ভিতর দিয়ে সমগ্র পূর্বাশা কথা কয়েছে—যে পূর্বাশা বহুদিন তমসার গর্ভে জ্যোতিহারা হয়ে সম্প্রতি রবিরশ্মিতে দীপ্যমান হয়ে উঠেছে।

ভারতের বাইরে যখন যেখানে গেছেন কবি নিজের আচারে আচরণে বাণীতে বিপুল একটা আলোড়ন তুলেছেন। সমগ্র জনসমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছেন নিজের প্রতিভার জাগরণী শক্তিতে। রবীন্দ্রনাথের এই পর্যটনার ভূমিকা দেশে দেশে ভিন্ন। তার কারণ দেশে দেশে পৃথিবী অসম। জনসমাজের বাঁচার নীতি সর্বত্রই স্বতন্ত্র। সেই কারণে আমরা যে বিশ্লেষণ করেছি তার জন্য সমসাময়িক পটভূমিকাকে সংক্ষেপে বিবৃত করার চেষ্টা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে দেশে দেশে যে রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক বিতর্কের ঝড় ওঠে তার বিস্তৃত আলোচনা করা সম্ভবপর নয় এই ক্ষুদ্র পরিসরে। আমরা এই পুস্তকে কেবলমাত্র দৃষ্টিভঙ্গিগুলি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। সম্পূর্ণতর আলোচনা করার ইচ্ছা রইল ভবিষ্যতে।

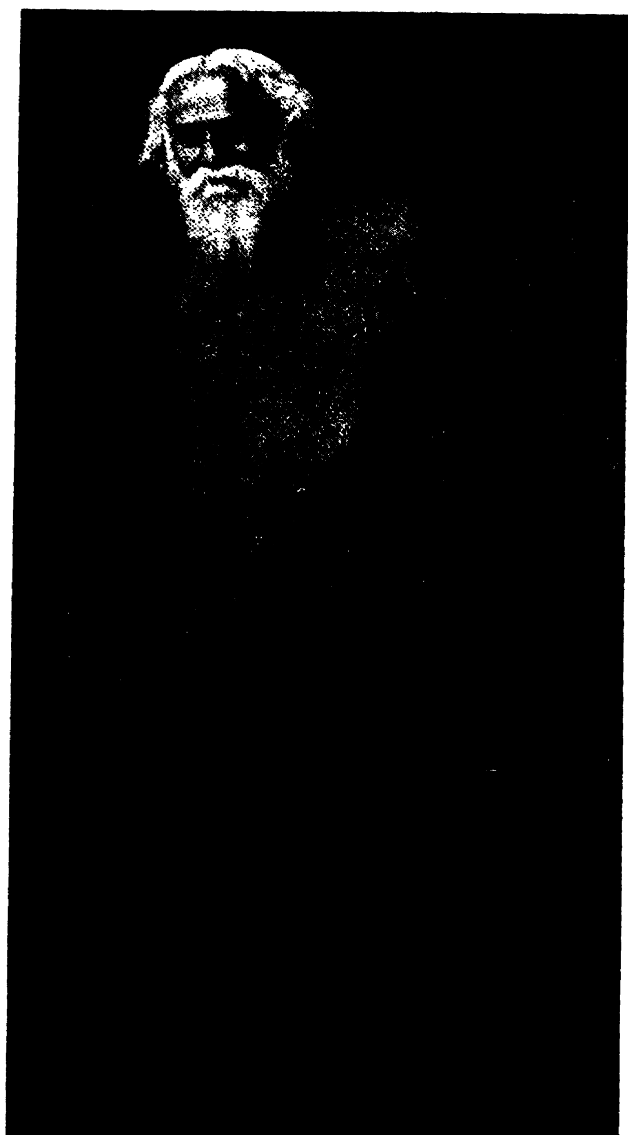
এই পুস্তক প্রণয়নে আমরা দেশী বিদেশী যে বহু পুস্তক ও পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি তার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য—ডাঃ আলেকজাণ্ডার আরন্‌সন এবং এলাহাবাদের গ্রন্থপ্রতিষ্ঠান 'কিতাবিস্থান'। ডাঃ আরন্‌সন যেসব মূল্যবান উপদেশ দিয়ে আমাদের ঋণী করেছেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে চাই না। এই সঙ্গে যাঁদের কাছ থেকে নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি তাঁদেরও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখছি।

পুস্তক প্রকাশে অনিচ্ছাকৃত যথেষ্ট ভুলত্রুটি রয়ে গেল—পরবর্তী সংস্করণে তাদের সংশোধন করতে চেষ্টা করব।

কোজাগরী পূর্ণিমা
কলিকাতা, ১৩৫২।

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
এশিয়ার বৈজয়ন্তী	...	...	১
রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে	...	...	৯
প্রাচীর বাণী	...	...	৪০
সমালোচকের দৃষ্টিকোণে	...	..	৬২
বিদেশে রবীন্দ্রনাথ	...	...	৭৮
বাংলা রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী	...	...	৯৬
রবীন্দ্র সম্পাদিত গ্রন্থ	...	...	১০৬
রবীন্দ্র সম্পাদিত সাময়িক পত্র	...	...	১০৭
রবীন্দ্র ইংরেজী গ্রন্থ	...	...	১০৮
বিদেশী সাহিত্যে রবীন্দ্র গ্রন্থের অনুবাদ পরিচয়		...	১১৫
বিদেশী ভাষায় রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী	...	...	১২৫
রবীন্দ্র পরিচয় বাংলা গ্রন্থমালা	...	...	১২৬



এশিয়ার বৈজয়ন্তী

রবীন্দ্রনাথ যখন নোবেল কমিটী কর্তৃক পুরস্কৃত হন, তখন নোবেল কমিটীর হাতে মাত্র ইংরেজী 'গীতাঞ্জলী'র অনুবাদখানি ছিল। কেবলমাত্র এই একখানি কাব্যপুস্তকের উপর নির্ভর করেই টেগোরকে এই পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

সুইডেন ভারত থেকে অনেক যোজন দূরের দেশ। ইতিহাসের পাতায় এই ভারতের সঙ্গে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান পেনিনসুলার প্রীতি ও সৌহার্দ্যের কোন সাক্ষী নেই। সংস্কৃতি, বাণিজ্য, জাতিগত মৈত্রী—কোন দিক দিয়েই দু'জাতির মধ্যে কখনও কোন মিলনের সেতু নির্মাণ করা হয়নি'। ইতিপূর্বে ভারতবর্ষ থেকে কোন বিশিষ্ট লোক ঐসব দেশে পরিভ্রমণ করে ভারতের সম্বন্ধে তাদের ঔৎসুক্য জাগায়নি'।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাদের ধারণা ছিল ভারতবর্ষের মতই অস্পষ্ট। তবু সুইডিশ কমিটী সহসা এই ভারতীয় কবিকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান দান করে যে ভাবে নিজেদের সম্মানিত করেছে, এতে বিস্ময়ের ঘোর লেগেছিল তৎকালীন পৃথিবীতে।

ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ—য়ুরোপ এবং আমেরিকা সবাই অবাক হয়েছিল—ক্ষুব্ধ হয়েছিল মনে মনে, এ কথা বলা চলে। যদিও নোবেল পুরস্কার লাভের আগেই রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডের বিদগ্ধ সমাজে যথেষ্ট সমাদর পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে চিরন্তনীর সুর, তাঁর রচনায়

যে দর্শনতত্ত্বের আশ্চর্য প্রাণময়তা, তা' মুগ্ধ করেছিল তৎকালীন ইংলণ্ডের সেরা সাহিত্যিক ও কবিদের। কবি য়েটস, রোদেনষ্টাইন, ষ্টফোডব্রুক, এজরা পাউণ্ড এঁরাই টেগোরকে আবিষ্কার করবার গৌরব করতে পারেন। কিন্তু মোটামুটি কবি তখনো য়ুরোপের পাঠক সমাজে অপরিচিত। সে কথা স্মরণ রাখলে সুইডেনে তাঁর পরিচয় ছিলই না বলা চলে।

আরো একটা সমসাময়িক ঘটনা মনে রাখতে হ'বে। সে হচ্চে এই যে, সে সময় য়ুরোপে শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা লিখছেন। জোলা, হার্ডি এঁরা তখনো নোবেল কমিটী কর্ত্তৃক বন্দিত হননি'।

এই রকম পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেলেন—এ আশ্চর্য ঘটনা!

শুধু এই নয়, রবীন্দ্রনাথ এই পুরস্কার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র য়ুরোপে এবং আমেরিকায় প্রধান ও প্রথম যে প্রশ্ন উঠেছিল—তার মূল কথা—এ কেমন করে সম্ভব হোল যে জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একজন ভারতীয়—একজন এশিয়াবাসী য়ুরোপ, আমেরিকাকে পরাজিত করল। এশিয়ার দেশগুলি সম্বন্ধে য়ুরোপ, আমেরিকার ধারণা অস্পষ্ট। এশিয়ার দেশগুলি ঘুমন্ত। তাদের প্রাচীন ইতিহাসের মতই সেগুলি জীর্ণ হয়ে পড়েছে। তাই য়ুরোপ আমেরিকার সভ্য শক্তি তাকে সভ্য করবার জন্য ঈশ্বরের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

কিন্তু তবু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের মহাকবি হলেন। সমসাময়িক মানুষের হাতে শ্রদ্ধার যে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য আছে তা' তিনি আদায় করলেন। এটা আশ্চর্য কথা সন্দেহ নেই।

এই সময় ঈশ্বরের অনুগৃহীত জাতের কথা তোলা হ'তো সব সময়। শ্বেতকায় জাতিগুলি ঈশ্বরের নির্দ্দেশেই বসুন্ধরাকে ভোগ করার চিরন্তন

অধিকার পেয়েছে। কৃষ্ণকায় জাতিগুলির কর্তব্য হচ্ছে, তাদের যথা-সর্বস্ব পণ করে এই শ্বেতকায়দের সুযোগ দান করা।

রবীন্দ্রনাথ শুধু যে নোবেল পুরস্কার পেলেন তাই নয়, একটা সমগ্র ভূখণ্ডকে তিমির গর্ভ থেকে সহসা প্রোজ্জ্বল আলোয় তুলে ধরলেন। সে জ্যোতির্ময়তা য়ুরোপ আমেরিকার দাম্ভিকতা সহ্য করতে পারেনি'। এই নিয়ে তৎকালীন পৃথিবীতে নানা কটু সমালোচনার ঝড় উঠেছে। কেউ কেউ বলেছে যে, এই পুরস্কার দানের পিছনে আছে রাজনৈতিক কারসাজী—কেউ বলেছে যে শ্রেষ্ঠ জাতিগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতার রেষারেষির মধ্যে পড়ে অযোগ্যের অমৃত লাভ ঘটেছে।

সব দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, এই পুরস্কার দানের পিছনে অনেক প্রশ্ন থাবা তুলে আছে।

তবু একথা অস্বীকার করার নয় যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতার ভিতর দিয়ে এমন একটা মহান মুক্তির দরজা খুলে দিয়েছেন, যার গবাক্ষ পথে মহৎ আনন্দের আলোর বন্যা নেমে এসেছে। এই মহৎ আনন্দের অধিকারী করেছেন যিনি পৃথিবীকে, তাঁকে বন্দনা করবে না তো পৃথিবী আর কাকে জানাবে হৃদয়ের আন্তরিক শ্রদ্ধা! তথাপি সেদিন যে সব বিপরীতমুখী আলোচনা হয়েছিল তার পটভূমিকা বিস্তৃত করে দেখা দরকার।

দু'ধরণের সমালোচনা তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল সেদিন। এক, রবীন্দ্রনাথ শ্বেতজাতির মানুষ নন্, আর দ্বিতীয়, ব্রিটিশ না জার্মান কোন্ জাতির মুখ চেয়ে এই পুরস্কার বিতরণ করল সুইডিশ একেডেমী।

—"ভারতে ব্রিটিশনীতি কি এই বাঙ্গালী কবির সম্মান লাভের পক্ষপাতী। ষ্টকহলমের নির্বাচকমণ্ডলীর এই সিদ্ধান্তের রহস্য চিরকাল গোপনই থাকবে।" (Neue Freie Presse, Viena, Nov., 1913).

বাহির বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ

আর্নেষ্ট রিস তাঁর রবীন্দ্রনাথের উপর লিখিত পুস্তকে উল্লেখ করেছেন যে, একজন বিখ্যাত সুইডিশ প্রাচ্যপণ্ডিত গীতাঞ্জলীর ইংরেজী তর্জমা প্রকাশের পূর্বেই টেগোরের কবিতা বাংলায় পাঠ করেছিলেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গীতাঞ্জলীর ছ'টি কবিতা এজরা পাউণ্ড সম্পাদিত Poetry কাগজে প্রথম প্রকাশিত হয় ইংরেজীতে।

যাঁর কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি হচ্ছেন সুইডেনের প্রিন্স উইলিয়ম। ১৯১২ সালে প্রিন্স কলিকাতায় আসেন। সেই সময় কবির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে। প্রিন্স উইলিয়মের এই পরিচয়ের ফলেই যে সুইডেন, কবির প্রতি এই সম্মান দেখিয়েছে এ প্রচার কার্য সেদিন করা হয়েছিল। কয়েকটি ইংরেজী পত্রিকা এই বলে সমালোচনা করে যে প্রিন্স উইলিয়ম জার্মান রক্ত বহন করছেন নিজে। সুতরাং এই ভারতীয়কে সম্মান জানিয়ে প্রিন্স ভারতে জার্মান প্রীতির বীজ বপন করেছেন। ব্রিটিশ শাসননীতির বিরুদ্ধে এই ভাবে প্রচারকার্য নিঃশব্দে চালান হচ্চে।

—"সুইডিশরা বলে যে প্রিন্সের কলকাতা প্রবাসই রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভের মুখ্য কারণ। ফরাসী এবং অন্যান্য প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতদের মতে এই বাঙ্গালী কবি মূলতঃ ভারতীয়ই নন; ইঙ্গ-ভারতীয় মিশ্রণ মাত্র—অন্ততঃ কবি হিসেবে ত বটেই।" (Truth, London, 24.11.1913).

এখানে একটু উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ব্রিটিশ পত্রিকার এই সমালোচনা উদ্দেশ্যবিহীন নয়। প্রিন্স উইলিয়ম স্বদেশে ফিরে ভারত অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যে বইখানা রচনা করেন, তার এক জায়গায় এই টেগোর ভ্রাতাদের সঙ্গে আলাপের উল্লেখ করে লিখেছেন—

"—আমাদের আলাপের মধ্যে সমসাময়িক ভারতবর্ষের কথা হচ্ছিল।

সেই আলোচনার সময় বোধ হচ্ছিল আমার, যেন দুই ভায়ের বুকে একটা কষ্টদমিত আগুন জ্বলছে। আলোচনার সময় তাঁদের দু'চোখ জ্বলজ্বল করছিল। তাঁরা দু'জনেই ব্রিটিশের প্রতি ঘৃণার কথা উচ্চারণ করেছিলেন। সভয়ে এবং সবিস্ময়ে আমি সেদিনের কথা স্মরণ করবার চেষ্টা করছিলাম, যেদিন এই ঘৃণা কর্মের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করবে।" (Prince William of Sweden : where the sun shines, 1913).

এ হোল এক দিককার ছবি।

অপরদিকে যে বৎসর টেগোর পুরস্কৃত হন, সেই বৎসরই জার্মানীর একজন নিজের প্রার্থী ছিল। রসেগার একজন কবি ও ঔপন্যাসিক। ভদ্রলোক জার্মান, কিন্তু তিনি বাস করতেন অষ্ট্রিয়ার এমন একটি অংশে যেখানে জার্মান ও চেক জনসংখ্যা প্রায় সমান সমান। চেকদের উপর জার্মানদের প্রতিপত্তি পাবার একটা কঠিন দুরভিসন্ধি ছিল এসময়। এ অবস্থায় রসেগার যদি নোবেল প্রাইজ পেতেন, তা'হলে চেকদের অবস্থা খারাপ হোত। সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে চেকদের উদরসাৎ করার একটা দারুণ সুবিধা হোত জার্মানদের। সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে তৎকালীন জার্মানীর উষ্মার কারণ সহজবোধ্য। জার্মানরা মনে করল যে, সুইডিশ কমিটী তাদের এই দুরভিসন্ধি সন্দেহ করে এই তরুণ ভারতীয় কবিকে সম্মান দিয়ে বসেছে সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠত্বের কথা বিচার না করেই।

সুইডিশ কমিটী যেন দ্রুত হস্তক্ষেপের ফলে জার্মানদের সম্ভাবনাকে মুকুলে ঝরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে।

"—এই অতি দ্রুত হস্তক্ষেপের দরুণ তরুণ ভারতীয় কবিকে এ বছরের সাহিত্য পুরস্কার প্রদান একটা সামান্যতায় পর্যবসিত হোল"।

এ গেল শুধু জার্মানীর আক্ষেপের কথা। শুধু জার্মানীই যে নিরাশ

হয়েছিল তা নয় সেদিনের য়ুরোপ ও আমেরিকা এই পুরস্কার দানে প্রচুর নৈরাশ্য ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছে। ষ্টকহলমের নির্বাচক মণ্ডলীর নির্বুদ্ধিতা ও সহানুভূতিহীনতাকে তারা ব্যঙ্গ করতে ছাড়েনি'। এর কারণ টেগোরের আগে যে সব সাহিত্যিককে নোবেল কমিটী পুরস্কার দান করেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই যোগ্য বলে বিদগ্ধ সমাজের কাছে সম্মানিত হননি'। এই সব সাহিত্যিকদের মধ্যে জার্মানীর পল হেসী ও ইতালীর কারডুচির নাম করা হোত। এঁরা শুধু যে বৃহত্তর বিশ্বে যথেষ্ট পূজ্য নন তা' নয়, নিজের দেশেই এঁরা সমাদৃত ছিলেন না। অথচ টলষ্টয়, এমিলজোলা এবং ষ্ট্রিণ্ডবার্গের মত প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিকরা সুইডিশ কমিটী কর্তৃক সম্মানিত হননি'।

১৯১৩ সালের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে যাঁদের নাম লোকের মুখে মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল, তাঁদের মধ্যে একজন ইংলণ্ডের টমাস হার্ডি এবং দ্বিতীয় জন ফ্রান্সের আনাতোল ফ্রাঁস। আনাতোল ফ্রাঁসকে তাঁর মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত এই সম্মানের জন্য প্রতীক্ষা করতে হয়েছিল। আর হার্ডির জীবনে এই বিশ্ব-সম্মান আসেনি'। এই দু'জনকে অতিক্রম করে টেগোরকে পুরস্কার দান করে নোবেল কমিটী একদল পত্রিকার কাছে নিতান্ত নিন্দাভাজন হোলেন।

যেদিন নোবেল কমিটীর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়, সেদিনই নিম্নোক্ত সমালোচনাটি দেখা গিয়েছিল কাগজে।

—"সম্ভবতঃ বিচারপদ্ধতিরই আমূল কোন পরিবর্তন হয়েছে। কারণ, সাহিত্যিক মূল্য নির্ধারণ করার সময় নোবেল কমিটী নিশ্চয়ই সাহিত্যিক-দের নিজস্ব মতবাদ এবং ভঙ্গীকে বিচার করতে সুরু করেছেন। এ ভিন্ন আর কোন সিদ্ধান্তের দ্বারা এই দু'জন প্রথিতযশা সাহিত্যিকের যোগ্য দাবী অস্বীকার করা যায় না।...নোবেল কমিটী হচ্ছে একটি রক্ষণশীল গোষ্ঠী।

ফ্রাঁসের সন্দেহবাদ এবং হার্ডির নৈরাশ্যবাদ দুই-ই আধুনিক ঝাঁঝের জন্য অপ্রিয়ভাজন হোল।" (Daily News, London, 14.11.1913.)

সমসাময়িক আরো একটি পত্রিকার ভাষণ আরো সিনিক।

—"এই ধরণের বই যে কেউই যত খুশী লিখতে পারে। কিন্তু এই ভেবে কেউ যেন প্রবঞ্চিত না হন যে এগুলির কিছু সৌন্দর্য আছে —তা সে সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গীতেই হোক—কাব্যেই হোক, অথবা এর অধ্যাত্মবাদেই হোক।" (New Age, London, 20.11.1913).

এই সঙ্গে প্রথম ধরণের আপত্তির একটি দু'টি উল্লেখ প্রয়োজন। এগুলি নিছক গা-জুয়ারী এবং আক্রোশ। কৃষ্ণবর্ণ জাতির যে কেউই (যদিও কবি অশেষ রূপবান ও গৌরবর্ণ) এ সম্মানের অধিকারী হবে এ যেন তারা বিশ্বাস করতে চান না। এই ধরণের জঘন্য মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিল আমেরিকার এবং কানাডার পত্রিকাগুলিই বিশেষ করে।

—"শ্বেত জাতির সাহিত্যিক সমাজ কিছুতেই উপলব্ধি করতে পারে না, কেন এই বিশিষ্ট সম্মান এমন একজনকে দেওয়া হোল যে শ্বেত নয়।" (News, Macon, Gal., 20.11.1913).

—"এই প্রথম ঘটল যে নোবেল পুরস্কার এমন একজনের হাতে গেল যে শ্বেত নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে কোন ব্যক্তি যে এই বিশ্ব-সম্মান পেতে পারেন, এই চিন্তার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে আমাদের কিছু সময় লাগবে।" (The Globe, Toronto, Canada, 16.6.1914).

এখানে মন্তব্য করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, যদিও ইংলণ্ডের সাহিত্যিক সমাজে ১৯১৩ সালের আগেই কবি পরিচিত হয়েছেন সার্থক স্রষ্টা হিসেবে, তবু ১৯১৩ সালের 'who's who'তে কবির নামোল্লেখ ছিল না। এ নিয়ে সেদিনের চমকিত ইংলণ্ডে প্রচুর সমালোচনা হয়েছিল।

বাহির বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ

শুধু এই নয় ১৯১৬ সালের প্রকাশিত Cambridge History of English Literatuie Vol. XIV'তে ইঙ্গ-ভারতীয় রচনা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের নাম সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে এই বলে মন্তব্য করেছিলেন—"পুরাতন কিছু বাদ দিলে ইঙ্গ-ভারতীয় সাহিত্য আজো অবধি সেই সব ইংরেজ নরনারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যাঁরা ভারত-বর্ষের জন্য জীবন সমর্পণ করেছেন।"

উপরোক্ত দু'টি উল্লেখ থেকেই প্রতীত হয় যে, নোবেল পুরস্কার লাভের তিন বৎসর পরেও এবং রবীন্দ্রনাথের লেখা, সেরা চলতি পুস্তকের মধ্যে অন্যতম হলেও এক শ্রেণীর সাহিত্যিক সম্পাদক টেগোরকে সম্পূর্ণ অবহেলা করে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু এ সব রাজনীতির গোলক ধাঁধাঁর জটিলতা। এ নিয়ে বিস্তৃত সমালোচনা আমরা পরে করবার চেষ্টা করেছি।

মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়ে ভারতবর্ষ তথা এশিয়াকে বাঁচিয়েছেন। জগতের সমক্ষে এশিয়ার যে শ্রেষ্ঠত্ব তিনিই তা' প্রতিপন্ন করে গেছেন। এরই ফলে সারা য়ুরোপ ঘুমন্ত প্রাচীর দিকে ফিরেছে—তার বিরাট জাগরণের একটা আশংকায় অস্বস্তি বোধ করেছে। রবীন্দ্রনাথের এই দান এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব। এর জন্য কবিকে প্রণাম করি।

রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে

১৯২১ সালের মে মাসে সারা য়ুরোপে রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে জার্মানী তার নিজের দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও লেখকদের লেখা পুস্তকাবলী কবিকে উপহার দেয়। জার্মানীর এই উৎসাহে ফরাসী মনীষীরা বিক্ষুব্ধ হন। জার্মানীর এই টেগোর বন্দনার প্রত্যুত্তর হিসাবে সমগ্র ফ্রান্সও স্থির করলে যে, কবির জন্মদিন উপলক্ষে তারাও তাঁকে এক সেট বই উপহার দেবে। এই রেষারেষির মনোভাবকে ব্যঙ্গ করে একখানি জার্মান পত্রিকায় লেখা হয়ঃ

—"এই সব দুর্বিনীত জার্মান যারা গত কাল ও আগামী কালের প্রতিদ্বন্দ্বী, যারা রাজনৈতিক কারণে এই ভারতীয় কবিকে তোষামোদ করছে—তাদের সত্যরূপ প্রকাশ করে দেবার জন্য ষ্ট্রসবার্গের ফরাসীরা স্থির করেছে, তারাও কবিকে পুস্তক উপহার দেবে। সমগ্র ফরাসী ক্লাসিক্‌সের একটা উপহার।" (Stuttgarter Zeitung, 29.7.21).

জার্মান পত্রিকার আর একটা খবরে প্রকাশ যে প্যারিসে এই নিয়ে আরো বিশৃঙ্খলতা সুরু হয়েছিল। সেখানে কবির ষষ্টিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে প্যারিস প্রবাসী ভারতীয়েরা স্থির করে যে, কবির জন্ম-দিবসের একখানি ভল্যুম প্রকাশ করা হ'বে—তাতে রচনা দেবেন ভারতীয় ও য়ুরোপীয় শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা। এই উপলক্ষে নিমন্ত্রিত সকল ফরাসী লেখক রচনা দিতে সম্মত হন। কিন্তু যখন তাঁরা শুনতে পেলেন যে, জার্মান লেখকদেরও আমন্ত্রণ করা হয়েছে,তখন তাঁরা নিজেদের প্রতিশ্রুতি

ভঙ্গ করলেন এবং দাবী করলেন যে জার্মানদের বাদ দিতে হবে। কিন্তু উদ্যোগী ভারতীয়েরা জার্মানদের বাদ দিতে রাজী হলেন না এবং এই কলরবের মধ্যে পড়ে জন্মদিনের ভল্যুম প্রকাশকেই বন্ধ করতে হোল।" (Morgan, Olten (switzerland), 21.8.1921).

উপরে উল্লিখিত এই সামান্য পরিস্থিতি থেকেই প্রতীয়মান হ'বে, যে-কোন দর্শকের কাছেই যে, রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে য়ুরোপের রাজ-নৈতিক মতবাদ কেমন করে ঘূর্ণিত হয়েছে—চূর্ণিত হয়েছে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। যুগে যুগেই দার্শনিক কবিদের নিয়ে এই ধরণের রাজনৈতিক পালোয়ানী প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু একটা দূর বিদেশ থেকে আসা কোন কবিকে নিয়ে এমন বিপর্যয়কারী আন্দোলন য়ুরোপে কখনো হয়নি'।

এইখানে আবার পটভূমিকাকে বর্ণনা করা প্রয়োজন। মনে রাখতে হ'বে যে, মহাযুদ্ধে জার্মানী হেরে গিয়েছিল। ফরাসী, ইংরেজ এবং আমেরিকান রাষ্ট্রপতিরা রাজনৈতিক কলে ফেলে জার্মানীর সমর-শক্তিকে পঙ্গু করে ফেলেছিল—তার একত্বকে গুঁড়ো করে দিয়েছিল। যুদ্ধোত্তর বৎসরগুলিতে একদিকে জার্মানী যেমন তার হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করবার জন্য দৃঢ়চিত্ত হয়ে ছটফট করছিল, যুদ্ধের বিপর্যয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য আক্রোশে ফুলছিল—অপরদিকে য়ুরোপ তার এই অস্বস্তিকে বৃদ্ধি করছিল কটু ব্যঙ্গের ভিতর দিয়ে। প্রাচী দর্শনতত্ত্বের প্রথম আসা প্রচারক হিসেবে মুলতঃ টেগোর তাদের জনগোষ্ঠীর একটা বৃহত্তর অংশকে জয় করেছিলেন। জার্মান জনমত যে টেগোরকে গভীর ভাবেই গ্রহণ করেছিল, তার মুলে প্রধানতঃ কোন রাজনৈতিক উস্কানি ছিল না। সেটা স্বাভাবিক ভাবেই গড়ে উঠেছিল। কিন্তু জার্মানীর এই টেগোর বন্দনাকে রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিচার করে বিজয়ী

দেশগুলি একে স্বার্থপ্রণোদিত বলে কুখ্যাত করছিল। টেগোর গিয়েছিলেন য়ুরোপের রাজনৈতিক এ্যাম্পিথিয়েটারে পালোয়ান হয়ে নয়। তিনি স্বভাবতঃই কবি। মানুষের মহত্তর জীবনাদর্শ তাঁর রচনায়—সর্বমানবের প্রতি মৈত্রী—এই তাঁর বাণী। তিনি চিরদিনই বিশ্বাস করে গেছেন যে, জাতিতে জাতিতে এই ক্ষুদ্রতার লড়াই একদিন শেষ হবে—মানুষ আবার একদিন ফিরে পাবে তার অমৃতের অধিকার।

য়ুরোপের রাজনৈতিক চাল সম্বন্ধে কবি ছিলেন একেবারে অন্ধ, যেমন কপালকুণ্ডলা ছিল সাংসারিক নীতি সম্বন্ধে। কবিকে সংবর্ধনা জানিয়েছে দেশের পর দেশ, গভর্ণমেণ্টের পর গভর্ণমেণ্ট—কবি স্বাভাবিক আবেগের সঙ্গে তাদের দেশকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, জাতির ঐতিহ্য ও জীবনাদর্শের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রশংসা করেছেন। কূটনৈতিক জালে ফেলে কবির এই বাণীকে তারা নানা ভাবে কাজে লাগিয়েছে—জনসাধারণের কাছে দেশের শাসন ব্যবস্থার সার্টিফিকেটগুলি ইচ্ছামত পরিবর্তন করে দেখিয়ে ভোট সংগ্রহ করেছে—দল বাড়িয়েছে। কবি যখন জানতে পেরেছেন, তখন তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং এই নিয়ে গড়ে উঠেছে তীব্র বিক্ষোভ ও বাদানুবাদ।

কবি জার্মানীতে সংবর্ধিত হবার পর জার্মান দার্শনিক প্রফেসর রুডলফ ইউকেনকে একখানি পত্র দিয়েছিলেন ডার্মষ্টাড থেকে। পত্রখানির তারিখ তের'ই জুন। ঐ পত্রে একদিকে যেমন জার্মানীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তাঁকে প্রচুর অভিনন্দন দানের জন্য, অপরদিকে তেমনি জার্মান জাতির মৌল জীবনাদর্শকে প্রশংসা করেছিলেন। নিজের ঐতিহ্যকে ভুলে না গিয়ে জার্মান জাতি যদি আবার হৃদয়ের ঐশ্বর্যকে জাগ্রত করতে পারে, তা'হলে জার্মানী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি হ'য়ে উঠবে একদিন—এমনি একটা আশ্বাস দিয়েছিলেন।

বাহির বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ

বর্তমান যুগের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাই যদি জার্মানীর ললাট লিপি হয়—যদি সে আবার অগ্নিশুদ্ধ হয়ে নিষ্ক্রান্ত হ'তে পারে—যদি নিজের বিরাট ভবিষ্যতের পথ ভাস্বর করে তুলতে পারে সেই অগ্নিশিখায়, যা' তাকে দাহন করছে—যদি জাগ্রত করতে পারে তার নিজের মহৎ মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়—তবে মানব ইতিহাসে জার্মানী ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাবে।

সমগ্র চিঠিখানিই তৎকালীন সকল জার্মান পত্রিকায় প্রকাশিত করা হয়েছিল। কিন্তু কূটনৈতিক চালবাজীতে এই চিঠির বিষয়বস্তু যেমন রাইন নদী উত্তীর্ণ হয়ে য়ুরোপের আসরে অবতীর্ণ হোল, দেখা গেল যে তাদের 'যদিত্ব' খসে গেছে এবং জার্মান জাতির প্রচার সচিব হিসেবে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশিত হয়েছেন।

এই চিঠিখানি যখন জার্মান রাজনৈতিক দপ্তর থেকে বেরিয়ে আসে তখন ফরাসীরা রবীন্দ্রনাথের এই প্রো-জার্মান মনোবৃত্তির জন্য আক্ষেপ করেছিল খুব। জার্মানী এবং ফ্রান্স দু'জাতিই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে টানাটানি করছিল সেই সময়। একখানি ফরাসী পত্রিকার মনোভাবে প্রকাশ ঃ

—"রবীন্দ্রনাথ যেন একজন হিন্দু টলষ্টয়। যেমন আশা করা যায় তেমনিই জার্মানী তাকে প্রোপাগাণ্ডার জন্য ব্যবহার করছে। তিনি জার্মানীকে নিয়ে মাতামাতি করেছেন—যার জন্যে রাইনের পশ্চাতের প্রেস গুলি গত কয়েকদিন ধরে সমস্বরে তাঁর জয়গান করেছে। 'জার্মান সভ্যতাই একমাত্র জগতকে বাঁচাতে পারে'—রাইখে অবস্থিতির সময় বক্তৃতা পর্যটনায় টেগোর বলেছেন। 'জার্মান সভ্যতা সর্বদিক দিয়ে প্রাচী সভ্যতার সম এবং এই সভ্যতার কাছ থেকেই য়ুরোপের সাম্প্রতিক মন আবার নবজীবন আশা করতে পারে।' যদিও টেগোর সম্প্রতি

ফ্রান্সে অবস্থান কালে কোন বিবৃতি দেননি'।" (L'Eclair, Paris, 20.6.1921).

১৯২১ সালের বিরাট উচ্ছ্বাসের পর ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ আবার জার্মানীতে গেলেন। দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের ব্যবধানে কবির আসন কিছুমাত্র টলেনি সে দেশের মানুষের হৃদয়ে। তিনি তখনো তাদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবিগুরু। হ্যামবুর্গে গিয়ে যখন কবি নামলেন, সংবর্ধনার প্রাচুর্য যা হোল তাতে ইঙ্গ-ফরাসী পত্রিকাগুলি আবার হতচকিত হল। ডেলী টেলিগ্রাফের একটি বিবৃতিতে প্রকাশ ঃ

"হ্যামবুর্গে কবির প্রতি যে সংবর্ধনা তা' মূলতঃ প্রচারমূলক। এর জন্মদাতা হোল সেই সব জার্মান ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিষ্ট, যারা এই ভাবে ভারতীয় বিদগ্ধ সমাজের কাছে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছে, যা' ভারতের বাজারে একচ্ছত্র বাণিজ্য অধিকারের পথ করে দেবে জার্মানীকে।" Shanghai Mercury, 25.10.1926.).

এই সময় একটা ভারী কৌতুককর ঘটনার উল্লেখ একান্ত প্রয়োজন। রয়টারের ব্রিটিশ সংবাদদাতার খবরে প্রকাশ যে ঠিক যে সময়ে রবীন্দ্র-নাথকে বার্লিনে প্রচুর সম্মান জানানো হচ্ছিল, প্রায় সেই সময় এলাহাবাদের ছাত্ররা জার্মান বিরোধী একটা আন্দোলন চালাচ্ছিল এই বলে যে, বার্লিনের পশুশালায় নানা শ্রেণীর পশুপক্ষীর প্রদর্শনীর সঙ্গে একশত জন ভারতীয়কেও সেই সঙ্গে প্রদর্শন করা হয়।

এই দু'টি ঘটনার সমন্বয় এবং সত্যতা যে অসংশয় তা' যথার্থ পাওয়া যায় তখনকার একজন পত্রিকা সংবাদদাতার লেখায়। এই বলে তিনি বিবৃতি দেন যে একটি বিশেষ বিকেলে বার্লিনেই তিনি সমগ্র ভারত পরিদর্শন করেছিলেন। প্রথমে মোটরে তিনি যান বার্লিন পশুশালায় ভারতীয় প্রদর্শনীতে এবং সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ মানব

রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনতে। এই ঘটনার অনেক পরে ১৯৩১ সালের একখানি পুস্তকে এই বলে লেখা হয় যে, পশুশালায় ভারতীয় প্রদর্শন মিথ্যা কথা—সেখানে যাদের দেখান হয়েছিল তারা সিংহলের আদিম অধিবাসী এবং রবীন্দ্র-সংবর্ধনার সময়েই যে, এই ঘটনা ঘটে এই মিথ্যা প্রচার করে বেড়িয়েছে রয়েটারের ব্রিটিশ সংবাদদাতা এবং এইভাবে জার্মানীকে হেয় ও কুখ্যাত করবার প্রয়াস করেছে ব্রিটিশ স্বার্থ। (**Furtwaengler : Indien, das Brahmanenland in Frueh-licht. 1931**).

এই সুযোগে কাউণ্ট কাইসারলিংয়ের কথা উল্লেখ প্রয়োজন। ১৯২১ সালে জার্মানীতে টেগোর বন্দনার মূল হোতা ছিলেন কাইসারলিং স্বয়ং। ভদ্রলোক সমসাময়িক জার্মানীর চিন্তাশীলদের মধ্যে একজন এবং তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠান জার্মানীতে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেছিল। কাইসারলিংয়ের এই 'স্কুল অফ উইস্‌ডম' রবীন্দ্রনাথের জন্য জন সংবর্ধনার সমস্ত আয়োজন করেছিল। তৎকালীন একটা পত্রিকা থেকে কিছু উদ্ধৃত করা হচ্ছে—

"টেগোর সপ্তাহে প্রতিদিন জার্মানীর নানা দিক হ'তে সহস্র সহস্র নরনারী সেখানে সমবেত হতেন। প্রতিদিন সকাল নটায় ও অপরাহ্ণ চারটায় উদ্যানে উন্মুক্ত সভা বসত। প্রশ্নোত্তরে কবি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিতেন এবং কাউণ্ট কাইসারলিং সেগুলিকে তর্জমা করে বলতেন। এই সব বক্তৃতা ও বিবৃতির বুলেটিন ছাপা হোত প্রতিদিন এবং সমগ্র দেশে সেগুলির প্রচার হোত।" (**The Servant, India, 11.8.1921.**)

এই প্রসঙ্গে কবির সংবর্ধনার একটি বিরাট দৃশ্য স্মরণে আসবে। এই সালের ১২ই জুন রবিবারে সেই প্রসিদ্ধ "বন সমাবেশ" ঘটেছিল। ঐ দিন চার সহস্রের অধিক লোক সমবেত হয়েছিল। কবি, গ্র্যাণ্ড

ডিউক হেসি এবং কাইসারলিং সমভিব্যাহারে নিকটস্থ একটা পর্বতের উপর আসন নিলেন। সেখানে সমগ্র জার্মান জাতির পক্ষ থেকে কবিকে জাতীয় সঙ্গীত ও নৃত্যের একটা বিপুল উৎসব অপণ করা হয়।

অনেকে সংশয় প্রকাশ করেন যে এই সব সংবর্ধনার মূল হোল স্বার্থ। য়ুরোপীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে জার্মানী কোণঠাসা হয়ে এই সুযোগ নিচ্ছিল আবার নিজেকে জাহির করবার, একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদের ভিতর দিয়ে। নীচেকার উদ্ধৃত অংশটুকু এই মনোভাবের স্বপক্ষে রায় দেবে।

'রবীন্দ্রনাথ ও জার্মানী' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে কাউণ্ট কাইসারলিং লিখেছিলেন—"যা অনেকে জানেন না এবং যা সকলের জানা উচিত সে হচ্চে এই সত্য যে, কবি ইতিপূর্বে কখনো জার্মান মাটিতে পদার্পণ করেন নি'। তিনি তাঁর সত্যদর্শনে প্রত্যক্ষ করেছেন যে, অনাগত ভবিষ্যতে জার্মানীই হ'বে সমগ্র য়ুরোপের আত্মিক ঐশ্বর্যের কোষাগার। কবি অনুভব করেছেন যে, জার্মানীতেই প্রথমে সংঘটিত হ'বে সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক রেঁনেসা। তাঁর দৃষ্টিতে আমেরিকা পূর্বের চেয়েও আরো বেশী বস্তুবাদী হয়ে উঠেছে। বিজয়ী দেশগুলির এসেছে আত্মিক অন্ধতা। জার্মানীতেই জন্ম নেবে নূতন মানবসমাজ। নিজের মহৎ হৃদয়ের সর্বস্ব দিয়ে কবিবর এ আস্থা রাখেন"।

এই প্রবন্ধটি তিনি প্রকাশ করেন যথার্থ মুহূর্তে। ঠিক এই সময় কবি নিজের বিপুল সংবর্ধনার উত্তরে সমগ্র জার্মানীকে বারে বারে ধন্যবাদ দিচ্ছিলেন।—"যাঁরা আমাকে একান্ত করে গ্রহণ করেছেন সেই জাতি ও সেই মহান দেশের মধ্যে নূতন জাগরণের একটা অপূর্ব বোধ আমার হয়েছে"। (Berliner Boersen Courrier, 21.5.1921.).

কবির এই উক্তিটিকে অত্যন্ত অশোভন ভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন কাউণ্ট এবং তৎকালীন মনোবৃত্তিসম্পন্ন পত্রিকাগুলিও।

তথাপি কবির প্রতি কাউণ্ট কাইসারলিংয়ের মনোভাব সন্দেহের অতীত ছিল। দু'জনেই চিন্তার ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। দু'জনেই যুগধর্মে সমবয়সী। কাউণ্টের মনোবৃত্তি প্রাচ্য ধর্মী—কবির জীবনে এবং সাহিত্যে প্রতীচ্যের ছায়া। সেই হিসেবে দু'জনের সাক্ষাৎকার ও নিবিড় সৌহার্দ্য গভীর সম্ভাবনায় পূর্ণ। জাতীয় আদর্শকে আবার জাগ্রত করার জন্য কাউণ্ট যদি টেগোরের মধ্য দিয়ে তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবে অনূদিত করতে চেয়ে থাকেন, তার মধ্যে অন্ততঃ দুর্নীতি নেই। হয়ত কবির পক্ষে সেটা অস্বস্তিকর।

এর পর জার্মানীতে এল ফ্যাসিষ্ট বন্যা। ধীরে ধীরে কাউণ্টই চলে গেলেন তমিস্রার অন্তরালে। মনুষ্যত্বের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে তাঁর যে মনের বিস্তৃতি তা' চুরমার হ'য়ে গেল। এরপর কবির সঙ্গে ছিল তার শুদ্ধ একটা আত্মিক নিগূঢ় যোগ, বাইরে যার নিগড় প্রত্যক্ষ নয়।

এই সময় মুল জার্মানীতেই অন্ততঃ কুড়িটি প্রধান দল এবং সমসংখ্যক অপ্রধান দল রাজনীতিক্ষেত্রে রেষারেষি করছে। সুতরাং এই ধরণের রাজনৈতিক সুবিধাবাদী মতবাদ প্রচারের কোন অসুবিধা ঘটেনি।

বামপন্থীরা অবশেষে বলেছে—"সাবধান, এই ব্যক্তিটি এসেছেন তোমাদের প্রগতিতে বাধা দিতে।. ইনি এসেছেন সেই তন্দ্রাতুর প্রাচীদেশ থেকে। এই কবির বাণী যা' অত্যন্ত অবাস্তব—তার কোন আবেদন নেই আমাদের পশ্চিম দেশের সমাজের জীবনে—যে সমাজ অগ্রগতিতে এবং শক্তিসঞ্চয়ে দুর্দম।"

আরো একটা উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। মনে রাখা দরকার যে এই সময় সমগ্র য়ুরোপেই ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে একদল ফুঁসছিল। রাশিয়া যা'

সম্ভব করে তুলেছিল তা' না পেরে একটা বিশিষ্ট শ্রেণী নির্দয় আত্মক্ষোভে দুরান্তের স্বপ্ন দেখছিল। এরা মধ্যবিত্ত সমাজের বাসিন্দা। এদের পত্রিকার বক্তব্যটি যেমনি বলিষ্ঠ, তেমনি ক্রুদ্ধ, জ্বালাময়।

"যদিও কবি বুর্জোয়াদের উদ্দেশ্যেই তাঁর বক্তৃতা দিচ্ছেন তবুও আমরা তাঁকে অপ্রশংসা করব না। এই বুর্জোয়াশ্রেণী তাঁকে নিজের দলে টানছে—চেষ্টা করছে তাঁর প্রাচুর্য নিয়ে নিজেদের স্বত্বাহীনতা ভরিয়ে তুলতে। য়ুরোপ তোমাকে কবি বলে, সত্যদ্রষ্টা বলে সম্মান করে। কিন্তু সে তোমার পথ জানে না—তোমার পথ সন্ধান করে না। যারা সে পথ খোঁজে তাদের পায়ে শৃঙ্খল। শৃঙ্খলিত তারা আর্তনাদ করে—মাথা তোলার চেষ্টা করে—একদিন তারা এই শৃঙ্খল চূর্ণ করবে। 'স্বাধীনতার' জয়ধ্বনিতে সেদিন পৃথিবী উঠবে কেঁপে।" **(14.5.21).**

উপরের মতবাদ যাদের, তাদের ছিল এই আক্ষেপ যে, কবিকে ওরা স্বতন্ত্র করে রাখল ওদের ভোজের টেবিলে, ওদের আসরে—ওদের বৈঠকে। যাঁর বাণী সর্বসাধারণের ভোগ্য, তাঁকে সাধারণের সঙ্গে মিলতে দেওয়া হচ্ছে না। পরেকার একটি পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, একক হিসেবে কবির বাণী তাদের হৃদয়ে এক আশ্চর্য সুর বাজিয়েছিল। এক জনের রচনা থেকে তুলে দিলে এই মূল সুরটি তার যথার্থ স্বরূপে ধরা পড়বে। রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে লেখা হয়েছে—

—"তুমি তাদের দেখতে পাও না, যারা তোমায় খোঁজে—যারা তোমার লেখার মধ্য দিয়ে তোমার সান্নিধ্যে পৌঁছেচে। এর পরিবর্তে তুমি দিন কাটাচ্ছ যত সব ধনী লোক আর আড়ম্বরসার মেয়েদের সাহচর্যে—তাদের দেওয়া সম্মানে তুমি খুশী হচ্ছ।" **(Die Kunstwache, Munich, August, 1921).**

ঠিক এই সঙ্গে দক্ষিণপন্থীদের মতবাদও লক্ষ্য করবার বিষয়।

তাদের ধারণায় কবি জার্মান জাতীয়তার মধ্যে বিশ্ববৃক্ষের বীজ বপন করেছেন। জার্মানী যে আর্যত্বে য়ুরোপের সেরা, এ ধারণা খণ্ডিত করছেন।

সুতরাং লেখা হোল জোরের সঙ্গে—

—"টেগোরের ধারণাগুলি কবিসুলভ মরীচিকা ভিন্ন আর কিছুই নয়। নিপীড়িত জাতির পক্ষে অবাস্তব স্বপ্নের নামান্তর। এগুলি গভীরভাবে গ্রহণ করতে পারে শুধু নিহিলিষ্ট আর বলশেভিক মনোবৃত্তির মানুষরা—আর কেউ নয়।" (Rheinish—Westfaelische Zeitung, Essen, 7. 12. 1921).

জার্মানীতে কবির উপস্থিতি এবং তাঁর বক্তৃতা নিয়ে জনসাধারণ এবং বিশেষ বিশেষ পার্টির মধ্যে যে বিবাদ ও প্রতিবাদ সুরু হয়েছিল তার কারণ নির্দেশ করা সহজ। খণ্ডিত জার্মানীর রাজনৈতিক এবং সংস্কৃতির হাজার প্ল্যাটফর্ম থেকে নানা কথা উচ্চারিত হয়েছে তাঁর সম্বন্ধে। তাদের মধ্য থেকে যথার্থ কোনটি, সেটি নির্ধারণ করা হয়ত দেবতাদেরও অসাধ্য। সুতরাং আমরা শুধু সেগুলির উল্লেখ মাত্র করেছি—মোটামুটি ভাবে তাদের পটভূমিকা ও লক্ষ্যনীয় বিষয়গুলি বর্ণনা করেছি। নিশ্চিত কোন মতবাদে উপস্থিত হওয়া সম্ভব কি?

এখানে আরো একটি ঘটনা বিবৃত করা প্রয়োজন। ১৯২১ সালে কবি ম্যুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতার প্রাপ্য এবং গ্রন্থ বিক্রয় বাবদ কবি পান ১০,০০০ মার্ক। কিন্তু জার্মানীর ক্ষুধাক্লিষ্ট শিশুদের জন্য কবি তাঁর সর্বস্ব জার্মানীকে দান করেন। তখন জার্মানীর অর্থনৈতিক দুর্দিন। তা' না হলে কবির জার্মান-পুস্তক বিক্রয়ের আয় হ'তে শান্তিনিকেতন নিরঙ্কুশভাবে চলতে পারত। এ নিয়ে কবি শেষ দিন পর্যন্ত আপশোষ করেছেন।

রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে

সমসাময়িক ইতালীর ছবিটি কিন্তু ভিন্ন ধরণের। ১৯২৬ সালেই ইতালীতে মুসোলিনী প্রধান হয়ে উঠেছেন। সর্বপ্রকারে বিরুদ্ধবাদী দলের নীতি দমিত হয়েছে—প্রেসের কণ্ঠ রুদ্ধ। ইতালীতে রবীন্দ্র-সংবর্ধনা হোল খুব প্রচুর। একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, ইতালীয় গভর্ণমেণ্টের নির্দেশেই সেদেশের জনসাধারণ কবির বিরাটত্বকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। বরং ইতালীর মানুষ তাঁকে গ্রহণ করেছিল সহজ আনন্দে। তবু একথা সকলের আগে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ইতালীয় গভর্ণমেণ্ট সর্বদাই নজর রেখেছিল যাতে কবির বিবৃতিগুলি ইতালীয় শাসননীতির পক্ষপাতিত্ব করে এবং মুসোলিনীকে রাজনৈতিক দিকপাল বলে নির্দেশ দেয়। প্রেস ও অভিনন্দনের চমৎকার বিন্যাসে মুসোলিনী তাঁর ঈপ্সিত ফল পেয়েছিলেন। কবির পর্যটনার মধ্যে ইতালী-অধ্যায় উপন্যাসের মত মনোহর এবং রোমাঞ্চক। এর সুরু থেকে বর্ণনা প্রয়োজন হবে মনে করি।

১৯২৫ সালে রবীন্দ্রনাথ ইতালীতে যান। বুয়েনস আয়ারসে বাস-কালে কবি ইতালী হ'তে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। ঐ সময় কবি এণ্ড্রুজকে পত্রে জানান—

"আমি জানি যে ইতালীতে আমি স্বাগত হব। তার কারণ বহু সূত্র থেকেই আমি শুনেছি যে সেখানকার লোকেরা সাগ্রহে আমার প্রতীক্ষা করছে—আমার বই সেখানে খুবই পঠিত হয়।"[1]

ইতালীতে অধ্যাপক ফার্মিকি তাঁর দোভাষীর কাজ করেন। ভদ্রলোক পরে শান্তিনিকেতনে যোগ দিয়েছিলেন।

ইতালীতে কবি তাঁর স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় পূর্ব্ব-পশ্চিমের সমালোচনা এবং 'ন্যাশানালিজমের' বাণী শোনান। পিপ্‌লস থিয়েটারে কবির বিপুল সংবর্ধনার আয়োজন হয়।

বাহির বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ

কবিকে কেন্দ্র করে এই সময় সমগ্র ইতালীর জনসাধারণ আশ্চর্য আগ্রহ এবং শ্রদ্ধার পরিচয় দেয়। কবি নিশ্চিত বুঝেছিলেন, ইতালীতে আসার প্রারম্ভে তাঁর মনের যে ধারণা ছিল তা' সত্য হয়েছে। ইতালী সত্যই তাঁকে চেয়েছিল। কিন্তু ইতালীর জনসাধারণ উদ্দীপিত হলেও ইতালীয় শাসননীতি টেগোরকে সুনজরে দেখেনি'। কবির প্রতি সরকারী ঔদাসীন্য অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল। অনেকের ধারণা যে ইতালীয় শাসকবর্গ যে নীতি গ্রহণ করেছে, রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ তার নিন্দা করে সরকারের বিরাগভাজন হয়েছেন। সমসাময়িক কালে য়ুরোপের নানা সংবাদপত্রে এই বিষয়ে মন্তব্য হয়েছিল।

ইতালীতে থাকতেই কবি ফার্মিকিকে নিমন্ত্রণ করে আসেন। এ-ছাড়া ইতালী গভর্ণমেণ্ট নিজেই অধ্যাপক তুচিকে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দেন। অধ্যাপক তুচির মত পণ্ডিত লোক শান্তিনিকেতনে ইতিপূর্বে কখনো নাকি আসেননি'। এই সময় মুসোলিনী ভারত ও টেগোরের প্রতি তাঁর সৌহার্দ্য জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারে ইতালীয় ভাষার সাহিত্য উপহার দেন।

রবীন্দ্রনাথ টেলিগ্রামে মুসোলিনীকে তাঁর হৃদয়ের প্রীতি জ্ঞাপন করেন। অধ্যাপক ফার্মিকি এই সময় দৌত্যরূপে কাজ করে রবীন্দ্রনাথের ইতালী পরিভ্রমণের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন। ইতালীতে মুসোলিনীর শাসননীতির ফলে সমগ্র য়ুরোপেই একটা বিক্ষুব্ধ মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। মুসোলিনী এই সময় সুচতুর রাজনৈতিকের মত টেগোরকে ইতালীতে আমন্ত্রণ করে স্বকার্য উদ্ধারের ষড়যন্ত্র করলেন।

রোমে রবীন্দ্রনাথ মুসোলিনীর অতিথি হন। মুসোলিনীর সাহচর্যে এবং তত্ত্বাবধানে কবি ইতালীর যে স্বরূপ প্রত্যক্ষ করলেন তাতে তাঁর নূতন দৃষ্টিলাভ হোল। ফ্যাসিষ্ট নীতির যে চেহারাটা তাঁর মনের মধ্যে

সজাগ ছিল, তার আমূল পরিবর্তন হোল। কবি নব্য ইতালী এবং তার শাসন বল্গাধারী মানুষটিকে ভালবেসে ফেললেন। এই সময়কার কবির স্বীকারোক্তি উল্লেখযোগ্য।

—"এই সুযোগে আমি পুলকিত যে, আমি দেখলাম একজন শ্রেষ্ঠ মানুষের কাজ—দেখলাম একটি অগ্রগমনের ছবি যা ইতিহাস স্মরণ করবে নিশ্চয়ই।" (Daily News, London, 11. 6. 1926)

ইতালী ত্যাগের পর তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি রঁলার কাছে বলেছিলেন—"মুসোলিনী তাঁর দেশের মানুষের জন্য শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে তাদের যে অবস্থা ছিল তার চেয়ে আজ জনসাধারণ সুখী, সমৃদ্ধ।······একটি জিনিষের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে—সে হচ্চে এই যে, আজকাল বিদেশীরা স্বচ্ছন্দে ইতালীতে পরিভ্রমণ করতে পারে। আমি শুনেছি যে, এ সমস্তই নাকি মুসোলিনীর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বে সম্ভব হয়েছে।"

এখানে স্মরণ করা প্রয়োজন যে ফ্যাসিষ্ট শাসননীতির আওতায় ব্যক্তিত্বের কণ্ঠ কেমন করে রোধ করা হয়। ইতালীর আভ্যন্তরীন অবস্থা সম্বন্ধে তৎকালীন য়ুরোপীয় ধারণা অস্পষ্ট। একজন মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা যেদেশে কোটি কোটি লোকের জীবনকে চালনা করে, সে-দেশ সম্বন্ধে একটা ধোঁয়াটে ধারণা করে কৌতূহলে অস্থির হচ্ছিল য়ুরোপে। ইংরেজ ও ফরাসী ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা যে, মুসোলিনী ইতালীকে সর্বনাশ থেকে বাঁচিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকেও এই কথা ফরাসী দূত রোমে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

কবি জন-সংবর্ধনায় ও মুসোলিনীর আতিথ্যে বললেন—

"মুসোলিনী মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর লিপিকুশলতায় গঠিত শরীর ও

মনের অধীশ্বর। ইতালীর অতীত যত উজ্জ্বল, তার ভবিষ্যতও তত ভাস্বর দেখছি আমি।"

ইতালী সম্বন্ধে বললেন—"আমি স্বপ্ন দেখছি যে তার অগ্নিপরীক্ষা থেকে ইতালীর অমর আত্মা অনির্বাণ দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল হ'য়ে আবার জাগবে।"

এই সময় ইতালীর প্রাচীন কলোসিয়ামের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পঁচিশ ত্রিশ হাজার ইতালীয় রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা নিবেদন করে। এই দৃশ্যের বিরাটত্ব এবং অনির্বচনীয় মহিমা শ্রীপ্রশান্ত চন্দ্র মহালনবীশ তাঁর বিবরণীতে প্রকাশ করেছেন।

এইভাবে কবি ইতালী ও ইতালীর শাসননীতিকে প্রশংসা করে নিজেদের অভিনন্দনের উত্তর দেন। কিন্তু কবি ইতালীর আসল রূপ দেখেননি'। ফ্যাসিষ্ট নীতির নিয়মই এই যে, সে তার ভণ্ডামীর মুখোস মুহূর্ত্তের জন্যে খোলে না—তার বাচনভঙ্গী ভোলে না। কিন্তু কবি ইতালী ত্যাগ করবার পর সাক্ষাৎ পেলেন সেই সব ইতালীয়ের, যারা প্রতিভাশালী, যারা যোগ্য মানুষ। অথচ যারা ইতালী হতে বহিষ্কৃত। তাদের বিবৃতিতে তিনি ফ্যাসিষ্ট ইতালীর নগ্ন, বর্বর রূপ প্রথম দেখতে পেলেন। এইসব জঘন্য অত্যাচারের কাহিনী শুনে এবং নিপীড়িত নরনারীর সঙ্গে আলোচনা করে কবি ফ্যাসিষ্ট ইতালীকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করে পত্র লেখেন। অগাষ্ট মাসের গোড়ায় পত্রখানি ম্যান্‌চেষ্টার গার্ডিয়ানে প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক ফার্মিকি এ পত্রের জবাব দিয়েছিলেন। ইতালীর গভর্ণমেণ্ট যে অত্যন্ত সরল বিশ্বাসে রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাবাণী গ্রহণ করেছিল এবং এখন যে রবীন্দ্রনাথ ইতালীর শত্রুদের আওতায় পড়ে নিজের কথাকে বিকৃত করছেন এই অনুযোগ করে ফার্মিকি পত্র লেখেন।



রবীন্দ্রনাথ ও রোমাঁ রোলাঁ

রবীন্দ্রনাথ তার জবাবে লেখেন যে মুসোলিনীর ব্যক্তিত্ব তাঁকে মুগ্ধ করেছিল—ইতালীর জনসাধারণের সৌজন্যে তিনি পুরস্কৃত, কিন্তু ইতালীর গভর্ণমেণ্ট যে নীতি গ্রহণ করেছেন তা' তিনি সমর্থন করেননি'—করতে পারেন না।

এই পত্র ইতালীতে প্রকাশিত হয়নি'। এইখানে আবার বলা প্রয়োজন যে ইতালীতে রবীন্দ্রনাথ যখনই কথাবার্তা চালিয়েছেন অথবা বক্তৃতা দিয়েছেন, দোভাষীর কাজ করেছেন একজন ইতালীয়।

প্রফেসর লেঁভি তাঁর পুস্তকে লিখেছেন—ইতালীতে সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের সঙ্গে আলোচনার সময় তিনজন কাজ করেছে। প্রথম জন রিপোর্টার, দ্বিতীয় জন দোভাষী এবং তৃতীয় ব্যক্তি কবি স্বয়ং। এ ছাড়া আরও একটি চতুর্থ উপস্থিতি সর্বদাই কথাবার্তায় গুঞ্জন করেছে এবং কবির অজ্ঞাতে সকল আলোচনার মধ্যে উপদ্রব করেছে।

উপরোক্ত চতুর্থ উপস্থিতিটির কথা কবি কি জানতেন না? রোমা রঁলার সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে কবি বলেছিলেন—

"ডুচের সঙ্গে আলাপের সময় আমার দোভাষী অধ্যাপক ফার্মিকি এক একবার অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে পড়ছিলেন। এর ফলে ডুচের সঙ্গে শান্তভাবে আলাপ করার সুযোগ আমি পেলাম না।" (২৫. ৬ ২৬).

কবি ইতালীতে কী ভাবে ব্যবহৃত হয়েছেন উপরে উদ্ধৃত অংশ দু'টি থেকে তা' সহজেই অনুমেয়। অথচ কবি নিজের অবস্থান সম্বন্ধে বিন্দু-মাত্র সন্দেহ করতে পারেননি'।

রোমা রঁলা রবীন্দ্রনাথের এই উচ্ছ্বাসে আশ্বস্ত হননি'।

কবি যখন রঁলার সঙ্গে আলোচনা করে য়ুরোপে পরিভ্রমণ করছেন, রঁলা তাঁকে যে চিঠি দেন তা' অপ্রকাশিত থেকে গেছে। তা' থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করে দিলেই রঁলার উদার হৃদয় এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পরিচয়

পাওয়া যাবে। রঁলা ও রবীন্দ্রনাথ যে, হৃদয়ের সম্প্রীতিতে পরস্পরের কত কাছে এসে পড়েছিলেন তা' জেনে হৃদয় আনন্দে ভরে ওঠে। রচনাটির বক্তব্য এইরূপ—

—"বারে বারে এই বলে নিজেকে নিন্দা করেছি যে আপনার ইতালীয় নিমন্ত্রণকারীদের আস্থা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে আপনার শান্তি ভঙ্গ করেছি। তবু আপনার যশ, যা' আপনার শান্তির চেয়েও আমি বেশী মূল্যবান মনে করি—তার কথা স্মরণ করেই আমি তা' করেছি। আপনার পবিত্র নাম নিয়ে শয়তানরা ইতিহাসের ক্রম নিবন্ধে জুয়া খেলবে এ আমি চাইনি'। আমার জন্য যদি আপনার কয়েক ঘণ্টার শান্তি ভঙ্গ হয়ে থাকে তার জন্য আমায় ক্ষমা করবেন। ভবিষ্যৎ যা' ইতিপূর্বেই বর্তমানে উপনীত,—প্রমাণ করবে যে আমি আপনার বিশ্বাসী বন্ধুর কাজ করেছি।" (১১. ১১. ১৯২৬).

রবীন্দ্রনাথের আক্রমণে ইতালী গভর্ণমেণ্ট সমস্ত প্রেসের কণ্ঠরুদ্ধ করে দেয়। রবীন্দ্রনাথের কোন চিঠিই ইতালীয় পত্রিকায় ছাপা হয়নি'। শুধু মুসোলিনীর নিজের পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে লেখা হয়েছিল—

—"যখন কয়েকটি তথাকথিত কালচার সার্কেলের বেকার লোকেরা বিখ্যাত কবি টেগোরকে আমাদের দেশে নিমন্ত্রণ করা স্থির করে, আমরা খুব উৎসাহী হয়নি'। নিজের এবং পৃথিবীর সৌভাগ্যে সাহিত্য সংসদ এবং সাধারণ কলাভবন ইতালীর প্রচুর আছে। ভারতীয়দের কাছে ইতালীর কিছুই শিক্ষণীয় নেই। যাই হোক—ফুল, নক্ষত্র এবং পাউণ্ড-ষ্টার্লিংয়ের কবি টেগোর টিউনিকের বোতাম খুলে ভাঙ্গা ইংরেজীতে অনেকগুলি পল্লীসভায় বক্তৃতা করেছেন।·· যে কবি নিজের দেশের পরাধীনতার কথা বোধ করেন না, তাকে আমরা 'মিথ্যা মিষ্টিক' বলি। ······ইতালী টেগোরকে দেখে হাসে—হাসে তাদের সেইসব লোককে

উদ্দেশ্য করে, যারা এই অসমর্থনীয় ব্যক্তিটিকে আমাদের মধ্যে এনেছিল।" (Popolo d'Italia—reproduced in Manchester Guardian 17. 7. 1926).

ইতালী অধ্যায় এইখানেই সমাপ্ত।

ইতালীর অবস্থায় এটা এখন সহজেই বোঝা যায় যে, যেসব দেশ ফ্যাসিষ্ট অথবা প্রো-ফ্যাসিষ্ট হয়েছে, তারাই রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে ব্যবহার করবার চেষ্টা করেছে অথবা তাঁর রচনা ও বিবৃতিতে কাঁচি চালিয়েছে। প্রকাশ যে, বুখারেষ্টে ১৯২৬ সালের বক্তৃতার পর আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়—

"কবির বক্তৃতা নৈরাশ্যব্যঞ্জক। কিছুই তিনি বলে নি'—নিজের যৌবন বয়সের কিছু স্মৃতির কথা উল্লেখ করেছিলেন মাত্র। এর কারণ হিসেবে বাইরে কানাকানি হচ্ছিল যে, তাঁর বিবৃতিগুলি রুমানিয়ান গভর্ণমেণ্ট আগেই ছাঁটাই করেছিলেন।" (Near East, London, 16. 2. 1926)

আরো মজার কথা এই যে, লিথুনিয়ান গভর্ণমেণ্ট ১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথের পুস্তক প্রচার বন্ধ করে দেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ একা এই বিপদে পড়েননি'। রয়েটার জানাচ্ছেন—

"লিথুনিয়ান গভর্ণমেণ্ট এক বিজ্ঞপ্তিতে সেক্সপীয়র, অস্কার ওয়াইল্ড এবং রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনার বিক্রয় বন্ধ করে দিয়েছেন।...... এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে এই সব পুস্তক দুর্নীতিমূলক এবং সমাজদ্রোহী।" (Westminster Gazette, 25. 4. 1927).

এর কারণ আর কিছুই নয় লিথুনিয়ান গভর্ণমেণ্ট য়ুরোপে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে পরমুখাপেক্ষী।

এখানে পুনরুল্লেখ হয়ত দ্বিরুক্তির দোষে দুষ্ট হবে যে, য়ুরোপের

মধ্যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সও রবীন্দ্রনাথকে রাজনীতির ক্ষেত্রে কোন প্রকার প্রাধান্য দেয়নি'। তার কারণ রাজনীতিতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স গত যুদ্ধের পর সম্পূর্ণ বলিষ্ঠতায় বিরাজ করছিল। অন্য দেশগুলিকে ইচ্ছামত বিচ্ছিন্ন, খণ্ডিত এবং দেউলিয়া করে দিয়ে তারা য়ুরোপ এবং দূরপ্রাচ্যে নিজেদের স্বার্থের জুয়ায় গভীর পরিতোষের সঙ্গে কাজ করছিল। বিশেষ করে ভারতের রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে কবির যোগাযোগ অনেক দিনের। পরাধীন ভারতের মুক্তির জন্য কবি এক সময় অনেক কিছু করেছিলেন। কিন্তু কবি হিসেবে তাঁর যে জীবন, সেখানে তাঁর মন সুন্দরের তপস্যা করে—স্বার্থোদ্ধত অবিচারের বিরুদ্ধে ফণা তুলে সর্বমানবের মুক্তির বন্দনা করে। তবু কবি বারে বারে অত্যাচারের বিরুদ্ধে—শক্তিমানের উদ্ধত ভঙ্গিমার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন। যা' সত্য বলে নিজের মনে সায় পেয়েছেন, তা' করতে তিনি কোনদিনই বিচলিত হননি'।

ইংলণ্ডে কবির খ্যাতি যখন প্রচুর তখনো বাংলাদেশে কবির রচনা নিয়ে যথেষ্ট কটু সমালোচনা হচ্ছিল। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল এবং তৎকালীন বহু প্রাচীন ও নবীন লেখক কবির রচনায় বস্তুহীনতা ও বুর্জোয়া মনোবৃত্তির পরিচয়ে বাদ-প্রতিবাদ করছিলেন। স্বভাবতঃই রবীন্দ্রনাথের মন দেশের এই অযৌক্তিক ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হচ্ছিল। এমন সময় কবির নোবেল প্রাইজ-প্রাপ্তির সংবাদ এদেশে এল।

একথা আজ হয়ত বিনা বাধাতেই উচ্চারণ করা যাবে যে, শুধু কবি নন, তাঁর পরম ভক্তরাও সহসা এতটা প্রসিদ্ধি ও সমাদর আশা করেননি'। কারণ সুইডিশ কমিটীর হাতে তখন গীতাঞ্জলির অনুবাদ ভিন্ন কবির অন্য কোন বই যায়নি'। সেই হিসেবে এই পুরস্কার লাভ

রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে

কবির মনকে যেমন বিপুল একটা প্রাপ্তির আনন্দে উজ্জ্বল করে তুলল, তেমনি অপরদিকে নিজের দেশের মানুষদের প্রতি একটা বীতরাগ জন্মাল। নোবেল পুরস্কার লাভ উপলক্ষে বিশিষ্ট জনসভায় কবির বিবৃতি সেদিন কি যে বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল, তা' প্রকাশ করা যায় না।

কবির এই পুরস্কার লাভে ইংলণ্ডের পত্রিকাগুলি মোটামুটি ভাবে যে সব ব্যাখ্যা এবং মন্তব্য করেছিল, তার বিবরণী স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে। তার মধ্যে অন্ততঃ কবিকে নিয়ে বিরাট একটা হৈ চৈ করা হয়নি'। বরং টেগোরের বন্ধু সাহিত্যিকদের মধ্যে কেউ কেউ ইংলণ্ডকে এই বলে নিন্দা করেছেন যে, একটা বিদেশী স্বাধীন রাজ্য টেগোরকে বিশ্বের বন্দনা জানাবার সৌভাগ্য আগে লাভ করল।

এক দিকে দেশবাসীর ঔদাসীন্য অপরদিকে ব্রিটিশ সাংবাদিক মহলের সম্মিলিত আনন্দপ্রকাশের অভাব—তৃতীয়তঃ সত্যসত্য আমেরিকায় 'ন্যাশানালিজমের' বক্তৃতার প্রতিঘাতে কবির মন ব্রিটিশ আমেরিকান মতবাদের উপর বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিল না। ভারতে অনুসৃত ব্রিটিশ নীতির গভীর প্রতিবাদ তিনি বারে বারেই করে' চলেছেন।

এই সময় সেই অতি কুখ্যাত "জালিয়নাবাগ হত্যাকাণ্ড" অনুষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ শাসকমণ্ডলী শুধু যে এই অনুষ্ঠানের জন্য দুঃখ প্রকাশ করল না তাই নয়, ইংলণ্ডের জনসাধারণ চাঁদা করে জেনারেল ওডায়ারকে তার বিপুল বীরত্বের জন্য পুরস্কৃত করল। সমগ্র ভারতবর্ষ গভীর ক্ষোভে অসহায়ের মত আর্তনাদ করে উঠল। সারা ভারতবর্ষের অন্তরের ক্ষোভের চেহারাটি কবি মূর্ত করে তুললেন তাঁর নাইট উপাধি ত্যাগে। এই সময়ে তৎকালীন ভাইসরয়কে লিখিত কবির পত্রখানি ভারতবর্ষের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। কবির এই উপাধি ত্যাগে তৎকালীন

ইংরেজ সমাজ এদেশে-ওদেশে গভীর ভাবে নাড়া খেয়েছিল। কিন্তু সেই আলোড়নের প্রতিঘাত হিসেবে তারা কবিকে যথেচ্ছা নিন্দা করে বসল। তখনকার ইংলিশম্যান কাগজের রচনাটি উল্লেখযোগ্য।

—"কবির এই আচরণে যেন ব্রিটিশের সম্মানবোধ, ব্রিটিশের যশ, ব্রিটিশ শাসনের নিরাপত্তা এবং ব্রিটিশের ন্যায়বোধের কোন ইতরবিশেষ ঘটবে। এই বাঙ্গালী কবি শুধু কবিই থাকুন বা নিরাভরণ বাবুই থাকুন কিছুই এসে যায় না।"

কোন কোন ব্রিটিশ পত্রিকা নিয়মমত ভারতের শাসনতন্ত্রকে নিন্দা করেছিল, কিন্তু তার মধ্যে সত্যকার আন্তরিকতা কতখানি আছে তা' বিচার-বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল।

এই সঙ্গে আরো একটি কথা বলা একান্ত প্রয়োজন। ১৯১৮ সালে কবি আবার বিদেশে যাওয়ার মনস্থ করেন।

১৯১৮ সালের ৯ই মে মিঃ এণ্ড্রুজ গভর্ণমেণ্ট হাউসে লাটসাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ গুরলের সহিত কর্মোপলক্ষে সাক্ষাৎ করতে যান। সেই সময় কথা প্রসঙ্গে গুরলে বলেন, সানফ্রানসিস্কোতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে কতকগুলি ভারতীয় যুবকের বিচার চলছে; তাদের কাগজপত্রের মধ্য হ'তে জানা গেছে যে রবীন্দ্রনাথও তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। স্মরণ করা প্রয়োজন যে, ১৯১৬ সালের অক্টোবর মাসে কালিফোর্ণিয়ায় কবিকে হত্যা করবার এক গুজব রাষ্ট্র হয়। গুরলে বলেন, কবির বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, ১৯১৬ সালে তিনি যে জাপান হয়ে আমেরিকায় যান, তা' জার্মানদের পয়সায়। পিয়ার্সন আমেরিকার কাগজপত্রে যে সব আপত্তিকর প্রবন্ধাদি লিখেছিলেন সেগুলি গুরলে এণ্ড্রুজকে দেখান।

কেবলমাত্র এই নয়, ঐ সময় ১০ই মে কবির কাছে সংবাদ এল যে,

পিয়ার্সন পেকিংএ ইংরেজ পুলিশের হাতে বন্দী হয়েছেন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে তিনি একখানি পুস্তিকা লেখেন। বইখানি জাপান হ'তে প্রকাশিত। যে কোন কারণেই হোক বইখানি নিষিদ্ধ পুস্তকের কোঠায় গিয়ে পড়ে।

এই ধরণের নানা ঘটনা পরম্পরায় কবির মন অন্তরে অন্তরে ইঙ্গ-মার্কিন দেশের উপর প্রসন্ন ছিল না।

এই সব কারণে কবি যখন য়ুরোপে যান, তখন য়ুরোপের নানা দেশের সংবর্ধনার প্রাচুর্যে কবির মন স্বভাবতঃই ব্রিটিশ ঔদাসীন্যে নিরাশ হয়। মনের এই ভাবকে কবি বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"আমাদের আধুনিক স্কুল মাষ্টার হচ্চেন ইংরেজরা। নূতন কোন আদর্শ গ্রহণ বিষয়ে অন্য সব য়ুরোপীয় জাতির তুলনায় তারাই বেশী অনুৎসুক। জাতি হিসেবে তারা সাধু, সৎ ও বিশ্বাসী। কিন্তু তাদের মধ্যে জান্তব প্রাণ-প্রাচুর্যই অধিক; যা ঘোড়দৌড়, খেঁকশিয়াল শিকার আর বকসিংয়েতে তার প্রকাশ খোঁজে। সকল প্রকার নবীন চিন্তা-ধারার ছোঁয়াচের প্রতি তারা প্রবল বাধা দেয়।" (Letters from Abroad, 10.6.1921).

রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যর গৌরব বৃদ্ধি হোল সন্দেহ নেই। এতে ব্রিটিশ জনসাধারণ এবং শাসকবর্গ সকলেই খুসী হলেন। কিন্তু কবি যখন শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করে প্রাচীন ভারতের আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তন করলেন তখন এদেশের শাসকপ্রতিনিধির দল মোটেই শান্তি পাননি'। এই ধরণের প্রতিষ্ঠানকে তারা সর্বদাই সতর্ক দৃষ্টিতে রেখেছেন। র‍্যামজে ম্যাক-ডোনাল্ডের মত লোক এক সময় বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের এই

প্রতিষ্ঠান পুলিশের চোখে সন্দেহের। এই প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষিত হয়ে যে সব নবীন যুবক বাইরে আসবে তারা তথাকথিত জীবন-প্রণালীতে স্বস্তি পাবে না। এ সম্বন্ধে লর্ড কারমাইকেল বলেছিলেন যে এই রকম ভুল গভর্ণমেণ্টের মোটা মাইনের কর্মচারীরাই করে থাকেন। তিনি নিজে পুলিশের গোপন খাতা থেকে এই ধরণের প্রতিষ্ঠানগুলির নাম বাদ দেবার চেষ্টা করেছেন। (**Nihal Singh. Tagore Memorial Supplement**)। এখানে আবার বলা প্রয়োজন যে নাইট উপাধি ত্যাগের পর কবি যখন বিলেতে যান, তিনি তাঁর পূর্ব পরিচিত বন্ধু ও ভক্তদের কাছে আগেকার মত সমাদর পাননি' এবং সে নির্তাপ আমন্ত্রণ কবি অনুভব করে পীড়িত হয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ প্রয়োজন যে কবির অক্সফোর্ডে ছাত্রদের কাছে বক্তৃতায় রাজকবি রবার্ট ব্রিচেসের সভাপতিত্ব করবার কথা ছিল। কিন্তু কবির রাজনৈতিক মতবাদের ফলে ব্রিচেস এই সভাপতিত্বে অসম্মত হন। এমনি নানা সময়ে, নানা কারণে কবির মত ব্রিটিশ নীতির উপর রূঢ় হ'য়ে ওঠে।

শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সারা পৃথিবীতে ইঙ্গ-মার্কিন নীতি স্বার্থের লোভে হানাহানি করেছে। যত বড় কবিই হোন না কেন, তিনি কোন দিন ভুলতে পারেননি', যে তিনি নিপীড়িত দেশের মানুষ। তাঁর বড়ত্ব যাদের নাগালের বাইরে সেই সব কোটি কোটি মানুষ যে শাসন-নীতির অধীনে শিক্ষায় বঞ্চিত হচ্ছে, স্বাস্থহানিতে জীর্ণ হচ্ছে—জগৎ-জোড়া অগ্রগতির দিনে যে শুধু পিছিয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে—তার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ জমা হচ্ছিল দিনে দিনে। বারে বারে য়ুরোপ আমেরিকা পর্যটন করে করে, সে দেশের কূটনীতি ও ভণ্ডামির আসল রূপ তাঁর কাছে আর অপ্রত্যক্ষ রইল না। জাপানী কবি নেগুচীর সঙ্গে পত্রালাপে,

রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে

কারারুদ্ধ জওহরলালকে উদ্দেশ করে লেখা ইংলণ্ডের অখ্যাত মিস রাথবেনের পত্রের উত্তরে কবি তাঁর সারা জীবনের সঞ্চিত মনোভাবের পরিচয় দিয়ে গেছেন।

কবি যখন রাশিয়ায় যান তখন সমগ্র সোভিয়েট রাশিয়ায় নূতন বাঁচার নীতি চলছে। স্বভাবতঃই কবির মনে এই অভূতপূর্ব উপলব্ধিতে মুগ্ধ হয়। মস্কো লেখকসঙ্ঘ কবিকে যে অভ্যর্থনা জানায় তাতে পেট্রোয় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন—

"মানব সভ্যতার ইতিহাসে গত দশ বৎসর ধরে যে ভাবে ঘটনা বিন্যস্ত হচ্চে তার কৌতূহলী দর্শকদের মধ্যে টেগোর অন্যতম। এ খুবই স্বাভাবিক যে টেগোরের মত কবিদৃষ্টি এবং প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি মানব ইতিহাসের অতি আবশ্যক পৃষ্ঠাটি যা অক্টোবর মহাবিপ্লব নামে পরিচিত, অবলোকন না করে যেতে পারেন না।"

পুরানো পৃথিবীর শিক্ষা বরবাদ করে সোভিয়েট রাশিয়া যে ভাবে আপনাকে গড়ে তুলছে তার সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা সহকারে তিনি 'রাশিয়ার চিঠি' লেখেন। বইখানি ইংরেজীতে অনুবাদ করা সম্ভব হয়নি—রাশিয়ান ভাষায় ত নয়ই।

তবু এবারে কবি সুরু হতেই সতর্ক ছিলেন। ইতালী, জার্মানী, য়ুরোপ ও আমেরিকার অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা হ'তে এবার তিনি রাশিয়ায় যা' কিছু বললেন সবই সংস্কৃতিমূলক। সেই কারণে সেগুলির সমাদর হোল খুব। লোকে তাঁকে একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান কবি বলে মনের মণিকোঠায় আসন দিল।

জাপান-অভিজ্ঞতাও কবির পক্ষে একই কাহিনী। যতদিন কবি হিসেবে তিনি সংস্কৃতির বাণী নিয়ে বক্তৃতা করছিলেন, তাঁকে ঘিরে

সাংবাদিক, ছাত্র ও জনমত উচ্ছল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কবির Message of India to Japan এবং The Spirit of Japan প্রবন্ধে কবি জাপানী সরকারের বিষদৃষ্টিতে পড়লেন। মুহূর্তেই সমগ্র জাপানের অভিনন্দনের আতিশয্য ম্লান হ'য়ে গেল। কবির জাপান প্রবাস কোন দিক দিয়ে সফল হয়নি'—হবার উপায়ও ছিল না।

গত যুদ্ধের সময় কবি আমেরিকায় যান। সেখানে সম্মান যত পেয়েছিলেন, কুখ্যাতিও জমেছিল অনেক বেশী। 'ন্যাশানালিজম' বক্তৃতা একদলকে যেমন মানবজীবনের বৃহত্তর অর্থের কথা জ্ঞাপন করছিল, তেমনি অন্যদিকে রাষ্ট্রকর্ণধাররা তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য ব্যঙ্গ করছিলেন। এসব কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। L. A. Times কবির ভাষা সম্বন্ধে বলেন—"কবির কণ্ঠে অপূর্ব ইংরেজী শোনবার জন্য একটা মহাদেশ অতিক্রম করা চলে।"

এ ধারণা একদিকের ছবি। অপরদিকে "সানফ্রানসিস্কো কল" কবির বক্তৃতার সমালোচনায় লিখেছিল—

"রবীন্দ্রনাথের এই দর্শন ভারতের জন্য কি, করেছে? আর আমাদের কি দশা হোত যদি আমরা সেই তত্ত্ব জীবনে গ্রহণ করতাম।

বৃদ্ধ ভারত ক্ষুব্ধ, অর্ধভুক্ত—ছিন্নকন্থা পরিহিত—বোধিদ্রুম তলে বসে আছে আর অনন্তের চিন্তায় ধ্যাননিমগ্ন। আত্মসমর্পণ বড় গুণ—তা' সে খৃষ্টানের মধ্যেই হোক আর পৌত্তলিকের কাছেই হোক। ভারতবর্ষ আত্মসমর্পণ মন্ত্র প্রচার করুন—আমরা আমেরিকানরা দৃঢ় সংকল্পকে ভাল বলে সাধনা করি।"

ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের চেহারাটি সত্যই ঐরূপ। পার্থিব জীবনে ভারত অসহায়—তার ছবি দুর্বিপাকের। শক্তিশালী জাতির

স্বেচ্ছাতন্ত্রে আর স্বার্থের রক্তমোক্ষণে ভারতের ঐশ্বর্য মরীচিকায় পর্যবসিত।

১৯২৯ সালে লস এঞ্জেলসে কবির পাসপোর্ট হারিয়ে যায়। কবিকে এমিগ্রেশন অফিসে যে ভাবে অপমানিত করা হয় তা' সমগ্র আমেরিকার শাসননীতির কলংক হয়ে আছে। এই সম্বন্ধে কবি জাপানী সাংবাদিকের নিকট যে বিবৃতি দেন, তা' তাঁর বলিষ্ঠ মনের পরিচায়ক।

"এতেই আমি খুশী যে আমার সামান্য খ্যাতির জন্য অফিসারটি আমার প্রতি ভিন্ন আচরণ করেনি'। প্রাচীবাসী এবং কৃষ্ণকায় জাতির প্রতি যে আচরণ তাইই করেছে।...সমগ্র এশিয়াবাসীর পক্ষ থেকে আমি গিয়েছিলাম এবং যেদেশ এশিয়াবাসীকে চায় না, সেদেশে আমি থাকতে পারতাম না।"

এখানে আরো একটি কথা বললে কবির মার্কিন দেশ ভ্রমণের ছবিটি সম্পূর্ণ হয়। ১৯৩১ সালে নিউইয়র্কে কবিকে হোটেলে ডিনার দেওয়া হয়। সেখানে নিমন্ত্রিত হন ছ'হাজার নরনারী। তৎকালীন পত্রিকার সমালোচনাটি চমৎকার।

—"নিমন্ত্রণের তালিকাটিতে ব্যবসায়ী ধনী লোকের নাম অনেক দেখা গেল কিন্তু একজনও কবির নাম নেই। এমন কি একজন সাহিত্যিকেরও নয়। এরূপ ব্যাপার কি কখনও ফ্রান্সে হোতে পারত।" (Saturday Review, 6 12.1931).

কবিকে একদল ধনী ও স্বার্থপর লোক এমন ভাবে ঘিরে রাখত যে কবি জনসাধারণের সঙ্গে আলোচনা করতে পারতেন না। কবিকে আমেরিকা সন্দেহের চোখে দেখত—তাঁর ব্রিটিশনীতির নিন্দা বন্ধুবৎসল আমেরিকাকে দুঃখ দিয়েছিল।

বাহির বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের আমেরিকায় বক্তৃতা শুনে Los Angels Express পত্রিকা লেখে—

—"যাই হোক অর্থ উপার্জন হিসেবেও আমেরিকানদের প্রয়োজনীয়তা আছে দেখছি। টেগোর তাদের ধনের জন্য সমালোচনা করেছেন কিন্তু সেখানে এসেছেন ত' তাদের উপার্জিত ধনের কিছু অংশ গ্রহণ করতে……ধন খুবই হীন পদার্থ, ধনোপার্জন বৃত্তি অত্যন্ত গর্হিত কিন্তু আমাদের সান্ত্বনা যে আমাদের এই তুচ্ছ ধন, যা তিনি এতই ঘৃণা করেন তাই তাকে এতদূর টেনে এনেছে। তিনি যার নিন্দা করেন তাই পাবার জন্য এসেছেন এবং এখানে এসে সেই কাজই নিজে করছেন যার জন্য এত নিন্দাবাদ"। **(L. A. Express, 17.10.1916).**

'সল্ট লেক ট্রিবিউন' ভারতের রাজনৈতিক ও সমাজগত ত্রুটির উল্লেখ করে কটু ব্যঙ্গ করে লেখে—

"স্যার রবীন্দ্রনাথ আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে কেবল দোষ দেখেন নি' আমাদের রাজনীতি সম্বন্ধেও দোষ দেখেছেন। কিন্তু এ সব কথার আলোচনায় পৃথিবীর বড় বড় সমস্যার প্রশ্ন উঠবে। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় দার্শনিকেরই এই সব আলোচনার সময় ও অবসর আছে।"

সমসাময়িক বিশ্ব রাজনীতির কথা স্মরণ করলে এবং গত মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় নিক্ষেপ করে এই সব সমালোচনার আলোচনা করলে তৎকালীন আমেরিকান মনোবৃত্তিকে তার যথার্থ পরিপ্রেক্ষণীতে লক্ষ্য করা যায়।

পরাধীন অভিশপ্ত ভারতবর্ষের কোন মানুষ যে আমেরিকাকে বাণী দান করতে যাবে এই হঠকারিতায় মার্কিন পত্রিকাগুলি এমন কটু হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ কবি ও দার্শনিক হিসেবে দেশের জনগোষ্ঠীর কাছে সম্মানলাভ করলেন বটে কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক দার্শনিকতা সেদেশ গ্রহণ করল না।

রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে

ইংলণ্ডেও যেমন, আমেরিকাতেও তেমনি কবির জনপ্রিয়তা হল না তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের জন্য। শান্তিনিকেতনের জন্য অর্থ সংগ্রহের যে একটা পরিকল্পনা কবির ছিল তা' ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। কবি দেখলেন যে এদেশ তাঁকে অতি শীতলভাবে গ্রহণ করছে। তাদের সকল অভ্যর্থনার মধ্যে ফরম্যালিটির পান হ'তে চুণ খসছে না বটে কিন্তু তার মধ্যে হৃদয়ের সেই সুরটি ত' পাওয়া যাচ্ছে না।

ফ্রান্স, আমেরিকা ও ইংলণ্ড—গত যুদ্ধের এই তিন বন্ধু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ঔদাসীন্য ও শীতলতা দেখিয়েছে প্রবলভাবে। তাঁকে ব্যঙ্গ করেছে, প্রশংসা করেছে এবং প্রয়োজনমত তোষামোদ করেছে কেবল-মাত্র নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য।

এই সব দিনের অভিজ্ঞতায় কবির নূতন দৃষ্টি লাভ হল। মোটামুটি ভাবে য়ুরোপ আমেরিকার সব নিন্দা প্রশংসাই যে ভণ্ডামী এ ধারণা তাঁর মূলীভূত হয়। তবে কবি হিসেবে এবং জগতের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে তাঁর যে দাবী তা, অস্বীকার করতে পারেনি' কোন দেশ। তা' সে ফ্যাসিষ্টই হউক বা ছদ্ম-ফ্যাসিষ্টই হোক অথবা গণতন্ত্রের মুখোসপরা সাম্রাজ্যবাদী শাসননীতিই হোক।

তবু এখানে স্বীকার করা প্রয়োজন যে, শান্তিনিকেতনের জন্য ইংলণ্ড ও আমেরিকার জনগণের নিকট হ'তে অর্থ সাহায্যের ব্যাপারে ব্যর্থ হলেও কবি আমেরিকান অর্থ প্রচুর পেয়েছিলেন। সে দু'চারজন বিশিষ্ট সহৃদয় মানবহিতৈষী ধনীর নিকট হ'তে। কিন্তু তার বিস্তৃত বিবরণ আমাদের পটভূমিকার পক্ষে অপ্রয়োজনীয়।

উইল ডুরাণ্ট আমেরিকার একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল লোক। ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে ডুরাণ্ট একখানি বই লিখেছেন। তার নাম The case for India। বইখানিকে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতে নিষিদ্ধ করে দেন।

বাহির বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ

এই বইখানি কবির নামে উৎসর্গ করে ডুরাণ্ট লেখেন—'শুধু আপনার জন্যই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পাওয়া উচিত।'

১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ চীন পরিভ্রমণে যান। চীন ও ভারত এশিয়ার দু'টি প্রাচীন দেশ। ইতিহাসের যেখানে স্থরু তারও অতীত প্রত্যুষ হ'তে চীন ও ভারত পরস্পরকে জানে। জ্ঞানের ভাস্বরতায় এই দু'টি দেশ সমগ্র পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করেছে। সে হিসেবে রবীন্দ্রনাথ চীনে যান কেবলমাত্র নিজের বাণী সঙ্গে করেই নয়—পুঁথিতে পড়া চীনের যে রূপ, তার যে আদর্শ—তা' নিজের জীবনে গভীরভাবে গ্রহণ করার একটা তাগিদও তাঁর ছিল। চীন ও ভারতের মধ্যে একটা আত্মিক সেতু পুনর্নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন কবি। ভারতের পক্ষ হ'তে এ দায়িত্ব গ্রহণ করা কবি ভিন্ন অন্য আর কোন লোকের পক্ষেই সম্ভবপর ছিল না।

এই প্রসঙ্গে সমসাময়িক চীনের রাজনৈতিক এবং আদর্শবাদী অবস্থার পর্যালোচনাও প্রয়োজন। ব্রিটিশ শোষণ ও শাসননীতির আওতায় ভারতবর্ষ নবজাগরণের জন্য উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে। এই সময় সমগ্র ভারত মিলিত শক্তিতে বিরুদ্ধ নীতিকে আঘাত হানবার চেষ্টা করছে। কিন্তু মহাচীনের অবস্থা তেমন নয়। চীন স্বাধীন দেশ। কিন্তু দুর্বল তার স্বাধীনতা। য়ুরোপীয় দেশগুলি এবং জাপান এই মহাচীনকে নিজেদের স্বার্থের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করছিল। পরস্পরের মধ্যে চলছিল জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই সময়কার চীনে নবীন জাগরণের একটা ঢেউ আসে। চীনের তারুণ্য প্রাচীন জরাগ্রস্ত চীনের আদর্শের উপর শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলছিল—যে আদর্শ তাকে জগতের

সমক্ষে হীন করেছে। য়ুরোপীয় আধুনিকতার প্রতি একটা আকর্ষণ বোধ করছিল তরুণ চীন।

এই সময় রাশিয়ার নূতন সোভিয়েট নীতি নিয়ে যথেষ্ট উৎকণ্ঠা প্রকাশ হচ্ছে। অন্ততঃ চীন এবং ভারতবর্ষ যাতে এই নূতন ধরণের লোকতন্ত্র না গ্রহণ করে বসে, এর জন্য শ্রেষ্ঠ শক্তিগুলি যথেষ্ট চেষ্টা ও প্রোপাগাণ্ডা করার কসুর করেনি। শুধু এই নয়—এই সময় সমগ্র চীনে একটা অন্তর্বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠছিল। প্রাচীন চীন প্রায় চূর্ণমান। বিদেশী শক্তিগুলি এই জীর্ণমান প্রাচীন দেশটিকে যথাসম্ভব রিক্ত করবার উদ্দেশ্যে গৃহবিবাদের অগ্নিতে ইন্ধন যোগান দিচ্ছিল। রাজনীতির ছাত্রের কাছে অজ্ঞাত নয় যে, এই সময় কয়েকটি ঘটনায় ব্রিটিশ চীন সম্পর্ক কলংকিত হয়ে ওঠে।

এই রকম সংকটজনক পরিস্থিতির মধ্যে কবি চীনের দ্বারে এসে দাঁড়ালেন। কিছুদিন হতেই 'নিখিল এশিয়ার' একটা মহৎ স্বপ্ন লোকে দেখছিল। এশিয়া আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন পাবে। রবীন্দ্রনাথ যে চীনে আসছেন সেই 'নিখিল এশিয়ার' স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দান করবার অভিপ্রায়ে এমনি একটা দুরভিসন্ধির কথা অনেক ইঙ্গ-মার্কিন পত্রিকায় লেখা হোল। আন্তর্জাতিক রাজনীতির আদর্শে কবির এই পর্যটনার অনুরূপ অর্থ করে অনেকেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। কিন্তু কবি তাঁর বক্তৃতায় এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, চীন ও ভারতের মধ্যে মৈত্রীর শ্লথ বন্ধনকে দৃঢ় করবার জন্যই তাঁর এই অভিযান।

তৎকালীন পত্রিকার উদ্ধৃতি উপরোক্ত সন্দেহের সত্যতা প্রকাশ করে।

—"চীনা ছাত্ররা কবির এই আগমন সংবাদে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে,

কারণ টেগোর য়ুরোপ ও আমেরিকার বৈদগ্ধের উপর এশিয়ার বৈজয়ন্তী এবং কবির এই আগমনে 'নিখিল এশিয়া' আন্দোলনের গোড়াপত্তন সম্ভব হবে।" (La Patric Montrial, Canada—15.4.1924).

কিন্তু কবি চীনের বক্তৃতা মণ্ডলীতে প্রাচীন চীনের আদর্শের জয়গান করলেন। নবীন চীন তাঁর বক্তৃতায় খুশী হল না। তাঁর বক্তৃতা সভায় চীনের তরুণ দল এই বলে ইস্তাহার প্রচার করত যে নবীন চীন টেগোরকে শ্রদ্ধা জানায়, কিন্তু তাঁর বাণী গ্রহণযোগ্য নয়।

কবির এই সময়কার বক্তৃতায় বিদেশী সমালোচক মহল কি ভাবে গোলমাল বাধিয়ে তুলছিল রোডনী গিলবার্টে'র একখানা পুস্তক হ'তে কিছু উদ্ধৃত করলে তা' অনুভব করা যাবে। এই বইখানিতে বলা হয়েছে—

"বার্ট্রাণ্ড রাসেল, জন ডিউই, টেগোর এবং কারখানার আমদানী করা আদর্শে চীনের ভবিষ্যৎ যে ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, গত তিন শতাব্দীতে চীনে আফিম, মরফিয়া, কোকেন এবং হাসিস আমদানীতে তা' হয়নি"। (What's wrong with China).

নিজেদের স্বার্থের জন্য বিদেশী আপাতমিত্ররা কি ভাবে প্রোপাগাণ্ডা চালিয়েছে উপরের উদ্ধৃতিই তার প্রমাণ।

কেবলমাত্র এই নয়—কমিউনিষ্ট আদর্শের দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথকে কটু সমালোচনা করা হয়।

তখন তরুণ চীনের চিন্তা জগতের নেতা ডাঃ হুসি। তিনি কবির সঙ্গে আলাপ করে বুঝেছিলেন যে বৃদ্ধ কবি প্রাচীন চীনের আদর্শকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন নিজের মনের স্থবিরতার জন্য নয়। আসলে কবির অন্তরে তারুণ্যের যে অগ্নি দীপ্যমান তা' ডাঃ হুসি লক্ষ্য করেন এবং কবির প্রতি শ্রদ্ধাবান হ'য়ে ওঠেন। ডাঃ হুসির এই মত

পরিবর্তনে চীনের তরুণদলও কবিকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দান করতে কার্পণ্য করেনি'।

চীনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বাণী ব্যর্থ হয়নি'। যতদিন কবি বেঁচেছিলেন চীনের সহিত তাঁর যোগসূত্র ছিন্ন হয়নি'—বরং আরো নিবিড় হয়ে উঠেছিল। চীন এবং ভারতবর্ষের ললাটলিপি যে এক—জগতে শ্রেষ্ঠ জাতি হ'তে হ'লে চীন ও ভারতবর্ষকে যে মৈত্রীর বন্ধনে থাকতে হবে চীনের অগ্রগামী দল যতই তা' উপলব্ধি করতে লাগল ততই টেগোরের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাও বৃদ্ধি পেতে লাগল।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান পেনিনসুলায়ও কবি বন্দিত হয়েছিলেন খুব। কোপেনহেগেনে কবি বিপুল সংবর্ধনা পেয়েছিলেন। কবি যখন ষ্টেশনে অবতরণ করেন, ছাত্রেরা মশাল জ্বালিয়ে বিরাট শোভা যাত্রা সহকারে কবিকে হোটেলে পেঁাছিয়ে দেয়। হোটেলের সম্মুখে সেই দিন ডেনিশ ছাত্রেরা বহু রাত্র অবধি জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে কবিকে অভিনন্দিত করে। অপূর্ব সে দৃশ্যের তুলনা হয় না!

নোবেল কমিটীর কাছে কবি যখন বক্তৃতা করেন, তার উল্লেখ প্রসঙ্গে উপসালার তৎকালীন আর্চবিশপ বলেছিলেন—

"সাহিত্যের জন্য নির্দিষ্ট নোবেল পুরস্কার তাঁদেরই উদ্দেশ্যে, যাঁরা নিজের মধ্যে কবি এবং সত্যদ্রষ্টার সমন্বয় সাধন করেছেন"।

রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন আর কেহই নিখুঁতভাবে সে সমন্বয় সাধন করতে পারেন নি'।

প্রাচীর বাণী

রবীন্দ্রনাথের ইউরোপে আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকেই সমগ্র ইউরোপে একটা নূতন সাড়া জেগেছিল। সে হচ্ছে প্রাচ্যদেশগুলিকে জানা। বর্তমান শতাব্দীগুলিতে য়ুরোপ ও দূর প্রাচ্য দেশগুলি সারা পৃথিবীকে চালনা করছে। সে কী জ্ঞানের ক্ষেত্রে, কী রাজনীতির ক্ষেত্রে আর কী মানুষের জীবন-দর্শনের তত্ত্ব জিজ্ঞাসায়। ভারতবর্ষ এবং নিকট প্রতিবেশী দেশগুলির অবস্থা দাঁড়িয়েছিল ঐশ্বর্যখনির মত। সে খনি-গুলিতে এক ধরণের মানুষ বাস করে যাদের বহু প্রাচীন অস্তিত্বের ধারাটি শুধু ফসিল হয়ে বজায় আছে, আর আছে প্রাচীন সমৃদ্ধিসম্ভারে। শুধু মাটির তলাতেই সেখানকার ঐশ্বর্য লুকিয়ে নেই—আছে সেদেশের মাটির ফসলে তার বহু-বিস্তৃত ভূভাগের উপর ছড়ান। সমগ্র য়ুরোপের পশুশক্তি সেই ঐশ্বর্যমণ্ডিত প্রাচীন রাণীটিকে ধর্ষণ করেছে অবিরাম। ভারতের স্বর্ণে পৃথিবীর রাণী সেজে বসেছে অধুনা ইংলণ্ড। চীনকে গুণ্ডার দলের মত ওরা একের পর এক ধর্ষণ করেছে।

কিন্তু যে কোন কারণেই হোক একটা প্রাচী-প্রীতি কেমন করে য়ুরোপের মাথায় ঢুকল বলা যায় না। এই অনুশীলনের ফলে প্রাচীর দর্শন, জীবন,—মানুষের সম্বন্ধে একটা আশ্চর্য বোধ জন্মেছিল তাদের। 'মিষ্টিক'—এই একটি ধোঁয়াটে কথায় সমগ্র ভারতবর্ষকে তারা ঘিরে রেখে দিয়েছিল। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এবং তাঁর রচনা যখন তাদের মধ্যে গিয়ে পড়ল, তারা তাঁকে মানুষ কবি হিসেবে গ্রহণ করতে পারলে না সুরুতেই—একটা মিষ্টিক ফ্রেমের মধ্যে ধরে তটস্থ হয়ে রইল। তাঁর

প্রাচীর বাণী

সেই আশ্চর্য সুন্দর গৌর বর্ণ আর প্রাচীন ঋষিদের মত মুখশ্রী যেন তাদের ধ্যানের দেবতাকে দেহধারী করে তুলল। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ তত্ত্বগুলির সহজ ধারণা যা তাদের হয়েছিল সে হচ্ছে এই যে, প্রাচ্যবাসী মানুষের জীবনের মহৎ আদর্শই হচ্ছে বাস্তব থেকে পলায়নী। পৃথিবীতে নানা সংঘাত, নানা লোভ, জীবনের জটিলতা, এর থেকে পালিয়ে মানুষকে উত্তীর্ণ হতে হবে এমন একটা লোকে যেখানে তার সংসার-শৃঙ্খল খসে যাবে—চিত্ত হবে মোহহীন এবং সেই নির্বাণ চিত্তের সম্মুখে তখন আত্মপ্রকাশ করবেন সেই পরম মঙ্গলময় পুরুষটি। এই ধরণের একটা পাইকারী হিসেব ভারতবর্ষের সম্বন্ধে য়ুরোপের জনসাধারণের মনে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যখন তাদের মধ্যে অবতীর্ণ হলেন, তাঁর চেহারাটা তাদের মধ্যে সেই রূপটিকে জাগ্রত করল বটে কিন্তু তাঁর রচনা তা করল না। তাই মনের প্রথম কুয়াসা কেটে যাবার পর একদল লোক এই বলে নিন্দা সুরু করল যে, রবীন্দ্রনাথ আসলে প্রাচ্যের মৌলজীবনকেই বহন করে আনেননি'। এখানে এসেছেন একজন ভারতের কবি, যাঁর রচনায় এবং জীবনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয় একীকরণ সম্ভব হয়েছে। এর কারণ রবীন্দ্রনাথের রচনায় তাঁরা সেই পরিচিত সুরটি ধরতে পারলেন না।

তবু 'মালঞ্চের' সমালোচনায় ইংলণ্ডের পত্রিকা সমালোচক সেই কথাটির উল্লেখ না করে পারেন নি। সেই প্রসঙ্গে নিজের দেশের কবিদের উপর তারা নিন্দা বর্ষণ করেছেন। টেগোরের কাব্যেই যে প্রাচীর মৌল বাণী এবং প্রাচ্যকে জানতে হলে টেগোরের মত কবিদের কাব্য অনুশীলন করতে হবে এ ইঙ্গিত তাঁরা দিলেন। ফিট্জারাল্ডের 'ওমর খৈয়ামে'র অনুবাদ এবং আরনল্ডের 'লাইট অফ্ এশিয়া' প্রাচ্য-মননশীলতার ছায়া মাত্র।

বাহির বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ

—"পরিশেষে এই কথাই আমরা উল্লেখ করতে চাই যে, এই ধরণের কবিতা সেই সব প্রচলিত কবিতার উপর প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছে যা' এদেশে পরিচিত করেছেন ফিটজারাল্ড, আরনল্ড এবং এদের অনুসরণকারী অন্যান্য সব কবিরা। সেগুলি মাধুর্যপূর্ণ এবং তাদের উৎসও প্রাচী কিন্তু প্রাচ্যের সেই আসল সুরটি রূপান্তরে হারিয়ে গিয়েছিল। প্রাচ্য সুর যে সম্পূর্ণ ভিন্নই তাই যথেষ্ট প্রমাণ হোল টেগোরের কবিতায়।" (Contemporary Review. Nov. 1913. Review of the 'The Gardener').

ইউরোপের প্রথম মহাযুদ্ধ বাধবার আগেই রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পান এবং নানা কারণে তাঁর পক্ষে নোবেল কমিটীর কাছ থেকে সদ্য সদ্য পুরস্কার নেওয়া সম্ভব হয়নি'। যুদ্ধের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় পর্যটনায় যান। সেখানে তিনি নানা ভাবে আমেরিকাবাসীর নিকট নিজের কথা প্রচার করেন। এশিয়াবাসী সম্বন্ধে আমেরিকার নীতিকে তিনি তীব্র নিন্দা করেন।

সহর থেকে সহরে—আসর থেকে আসরে—এক লেকচার হল থেকে আর এক টাউন হলে তিনি বৈশাখী ঝটিকার মত তাঁর এই বাণীকে প্রচার করে বেড়ান। কোন কোন জায়গায় তাঁকে নানাভাবে প্রতিরোধ করবার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু কবি সেদিকে দৃক্‌পাত করেননি'। একটা সমগ্র ভূ-খণ্ডের অবদমনের তীব্র মনোভাব তিনি ছড়িয়ে দেন। এ তাঁর একটা নূতন দায়িত্ব এবং তা' পালন করতে তিনি কসুর করেন নি। 'ন্যাসানালিজমে'র আসল অর্থ কি এবং তার প্রকাশ রূপটিই বা কি —এর একটা স্বচ্ছ বাণীকে তিনি রূপায়িত করবার চেষ্টা করেন। সমগ্র আমেরিকা তাঁর এই নূতন বাণীকে অবহেলা করেই উড়িয়ে দেয় অথবা প্রাচ্যের চিরকালীন পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচায়ক বলে অবহেলা করে।

তবু একথা স্বীকার্য যে প্রাক্‌যুদ্ধ য়ুরোপে একটা নূতন অশান্তি মাথা তুলছিল। তার কারণ যন্ত্র সভ্যতার যে রূপ ক্রমশঃ প্রকট হ'য়ে পড়ছিল তার শেষ পরিণতির কথা ভেবে শংকিত হচ্ছিল য়ুরোপের মনীষী ও কর্ণধাররা। এই আশ্চর্য মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের বাণী স্বভাবতঃই এতটা নূতন সাড়া এনে দিয়েছিল সেদেশের চেতনাবোধে। বিশেষ করে যারা ভারতবর্ষ এবং প্রাচ্যের বাণীর সঙ্গে পরিচিত তারা সকলেই একথা স্বীকার করলেন যে রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে প্রাচ্য আবার তার নূতন বাণীকে সমগ্র পৃথিবীর সামনে উদ্‌ঘাটিত করে দেবে।

জার্মান উপন্যাসিক হেরমান হেসী প্রাচ্যদেশ পরিভ্রমণের পর ফিরে গিয়ে লিখেছিলেন—

"সমগ্র প্রাচ্য ধর্মের রসে পুষ্ট হয়ে প্রতীচ্য বেঁচে আছে তার বুদ্ধি-ধর্মিতায় আর বিজ্ঞানে। ······এই বোধ এত প্রবল হচ্চে তার কারণ আমাদের মন তীব্রভাবে অনুভব করে প্রাচ্যের সেই বিশেষ শক্তিমত্তা এবং প্রতীচ্যের দুর্বলতা এবং অসম্পূর্ণতা। এই অসমতা আমাদের দ্বিধাকে, আমাদের ভয়কে এবং আমাদের আশাকে জাগ্রত করছে। ভারত অথবা চীন থেকে আমদানী করা কোন তত্ত্ব অথবা সমগ্র প্রাচ্যের কোন আধ্যাত্মবাদ আমাদের রক্ষা করতে পারবে না স্বভাবতঃই। পরন্তু এই আজ সহজভাবে প্রত্যক্ষ হয়েছে যে পশ্চিমের সভ্যতার ধারাটি বজায় থাকবে এবং তার পুনরভ্যুদয় সম্ভব হবে যদি আমরা আত্মার নূতন নির্দেশ আবিষ্কার করতে পারি—এমন কোন তত্ত্ব যা' সর্বমানবের পক্ষে প্রযোজ্য হ'বে।" (Der Bund (Switzerland), 1915).

উপরের রচনাটি যুদ্ধকালীন। এর ভিতর দিয়ে সমগ্র য়ুরোপের ধারণাটি স্বতঃই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। প্রাচ্যদেশগুলি যেভাবে

বাহির বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ

ইতিহাসের সমস্ত উত্থান-পতনের মধ্যেও অস্তিত্বের ধারাটি বজায় রেখেছে —এটা বিস্ময়কর ঠেকছিল তাদের কাছে। যদিও যুগধর্মের, প্রগতির অনেক পিছনে পড়ে এই সব প্রাচ্যদেশগুলি নানাভাবে রিক্ত হয়েছে—তবু কি একটি বস্তু যা' না হারিয়ে তারা লুপ্তশিখা হয়ে যায়নি'। যুদ্ধের বহ্নিমুখে দাঁড়িয়ে সমগ্র য়ুরোপের জনসাধারণ অবশ্য রবীন্দ্রনাথের এই নূতন স্বর শুনতে পায়নি কিন্তু চিন্তাবিদরা বুঝেছিলেন যে, একটা নূতন ভাবের ঢেউ আসছে সেই পুরানো প্রাচী দিগন্ত থেকে—যার ঝাপটা সহ্য করতে হবে য়ুরোপকে।

যুদ্ধের পর য়ুরোপে এল দারুণ বিপর্যয়। কোন দেশ জয়ী হোল—কেউ বা যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়ে নিজের গুহায় এসে ক্ষত লেহন করতে লাগল। কিন্তু যুদ্ধে জয়ী অথবা বিজয়ী—দু'জনেই হৃতসর্বস্ব হয়ে দেউলিয়া হোল। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান হোল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিষবৃক্ষের বীজ বপন করে। হিংসায় ও আক্রোশে তাদের নাড়ীর ভিতর টনটন করে উঠল।

এই দারুণ বিপর্যয়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যখন গিয়ে দাঁড়ালেন তখন জনসাধারণ মুখ তুলে দেখল তাঁকে। সংসারে লোভ আর স্বার্থের হানাহানির শেষে তারা তখন শান্তি খুঁজছিল—প্রতীক্ষা করছিল নূতন বাণীর। জাতিগত ভাবে তারা নূতন আদর্শের জন্য বুভুক্ষু হয়েছিল যত না, তত বেশী হয়েছিল ব্যক্তিগত ভাবে। কারণ বিপর্যয়ের তরঙ্গ এসে লেগেছিল তাদের প্রত্যেকের ঘরে, জীর্ণ হয়েছিল তাদের স্বতন্ত্রতা। ঠিক এই একটি আশ্চর্য মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথকে তারা আঁকড়ে ধরল।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ কবি থেকে মেসায়া হয়ে উঠলেন। রবীন্দ্রনাথের মত একজন সার্থক শিল্পীকে যথাযথ ভাবে গ্রহণ করতে না পেরে

তাঁর মনীষাকে নিয়ে এই যে অকুণ্ঠিত উচ্ছ্বাস তা'তে একদিকে যেমন আমাদের কবির শ্রেষ্ঠত্বের কথা চিন্তা করে হৃদয় পুলকিত হয় তেমনি আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে বিপর্যস্ত য়ুরোপের আন্তরিক রিক্ততার কথা। প্রাক্‌যুদ্ধ য়ুরোপের দম্ভ তখন ধূলি-লুণ্ঠিত।

একখানি অষ্ট্রিয়ান পত্রিকায় লেখা হয়েছিল—

—"একজন ঋষিকে আমরা মুখোমুখী দেখলাম।······তাঁর হাতের একটি ভঙ্গিতেই মন্দিরের সম্মুখের যবনিকা অপসারিত হয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ দেউলের দৃশ্য প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে পারে আমাদের মানব চোখে। শত সহস্র মানুষ তাঁর বাণীর সম্মুখে নতজানু হয়ে বসতে পারে—তাঁর পরিধানের প্রান্ত চুম্বন করতে পারে। সমগ্র মানব সমাজ বাক্‌রুদ্ধ হয়ে শোনে—শত শতাব্দীর বাণী উচ্চারিত হচ্ছে।" (Widerhall, Innsbruck, Austria, 1-8-1921).

এই ধরণের গুরু বন্দনাকে কোন কোন সমালোচক অতিশয়োক্তি দোষে অপরাধী করে বসেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে মনের বুভুক্ষার সঙ্গে সমতারাখা কোন বাণী পেলে সাধারণ লোক মানুষের মধ্যেও দেবত্ব অর্পণ করে বসে। এ কোন দেশেই নূতন নয়। তার উদাহরণও বিরল নয়।

এরই সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে উল্লেখ করা চলে এজরা পাউণ্ডের গীতাঞ্জলির সমালোচনা। পাউণ্ডের মত মনীষীও গীতাঞ্জলির আলোচনায় নিজের মনের গভীর অনুরণনকে অস্বীকার করতে পারেন নি'। তিনি লিখেছিলেন—

—"নিউ টেষ্টামেণ্টের প্রথম পর্বের মতই এঁর বাণী—এ কবিতাগুলিতে সেই একই আনন্দের সুর।" (Fortnightly Review, March, 1913).

যেমনই হোক রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিককার রচনায় যে আশ্চর্য বাণী ছিল তা য়ুরোপের কাছে খৃষ্ট ধর্মের রূপকেই আবার জাগ্রত করে তুলেছিল। অনেকে মনে করতেন খৃষ্টানধর্মের মৌল ভাবই রবীন্দ্র রচনার প্রেরণা।

—"রচনার দিক দিয়ে টেগোরের কবিতাগুলি মূল্যবান কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা যে এগুলি একটি নূতন প্রভাতের সম্ভাবনায় মন্থর। বহুদিন থেকে আমরা ঔৎসুক্যের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছিলুম সত্যিকার হিন্দুমনের উপর খৃষ্টানধর্মের প্রভাব প্রত্যক্ষ করবার জন্য। নিঃসন্দেহেই এই প্রথম আমাদের আশা সফল হোল। যখন অনুভব করছি যে এই কবির প্রতিটি কথা প্রতীক্ষমান কোটী কোটী মানুষ গ্রহণ করছে—এ আশা কি আমরা করব না যে সেই নূতন খৃষ্টান ভারতবর্ষ—জাগ্রত ঐ।" (Baptist Times, 13.2.1914)

এ ধরণের প্রচার কার্য করছিলেন মোটামুটি য়ুরোপের ধর্ম-প্রচারকরা। যারা চিরকালই বলে আসছেন যে শতধা বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষ আবার এক হবে ব্রিটিশের শাসনছত্র তলে, যদি ভারতে আরো মিশনারী পাঠানো হয়—ধর্মপ্রচার আবার প্রবলভাবে চালানো হয়।

রবীন্দ্রনাথ আকৃতিতে—তাঁর বাচন ভঙ্গীমায়—তাঁর প্রশান্তিতে য়ুরোপের কাছে একজন প্রাচীন প্রফেট। তারা বলত যে যদিও ঐই কবি খৃষ্টান নন তবু তিনি সাধারণ খৃষ্টানের চেয়েও বেশী। তাঁর বাণীও খৃষ্টানিটির প্রতিকূল নয়।

Dean Inge of St. Paul সেকালে লিখেছিলেন—

—"টেগোর খৃষ্টান নন। কিন্তু তাঁর জীবনপ্রণালী ও কথায় এই প্রমাণ হয় যে খৃষ্টান ধর্মের আদি উদ্ভব প্রাচী দেশে। বারে বারে

তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ খৃষ্টানের চেয়েও অধিক ধার্মিক বলে বোধ হচ্ছিল।" (Boston Evening Transcript, 4.4.1925).

ডার্মষ্টাডে তাঁর বক্তৃতা যাঁরা শুনেছিলেন তাঁরা বলেছেন যে রবিবারের সকালে পাহাড়ের উপরে রবীন্দ্রনাথের নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা শুনতে শুনতে বারে বারে মনে হয়েছে যে তিনি একজন প্রফেট।

পূর্বেই বলেছি যে য়ুরোপের চিন্তাবিদরা যুদ্ধের ভিতরেই শংকিত হয়ে উঠছিলেন প্রাচ্যের এই অনধিকার প্রবেশে। যন্ত্রে সজ্জিত হয়ে য়ুরোপ যে ধ্বংসের মুখে ছুটেছে এবং তার সভ্যতার আদর্শ যে তার দেশের মানুষকে মহৎ জীবনের মরীচিকামাত্র দেখাচ্ছে—এমনি একটা সন্দেহ যে হচ্চে সে দেশের মানুষের মনে এ অভিজ্ঞান তাঁরা পেয়েছিলেন। শুদ্ধ সেই কারণে একদল চিন্তাগুরু "য়ুরোপের সব ভাল" এমনি একটা আন্দোলন চালাচ্ছিলেন।

এই ধরণের একটা মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন লরেন্স। যদিও লরেন্স চিন্তার ক্ষেত্রে প্রাচ্যধর্মী তবু তিনিই Defence of the West'র দায়িত্ব নিজের অপটু কাঁধে তুলে নিতে কসুর করেননি'।

—"আমাদের য়ুরোপীয় সভ্যতা আসলে কত উন্নত—এ যত আমি দেখছি ততই উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছি। প্রাচ্যদেশে ভারত ও পারস্য এর কল্পনাও করতে পারে না।...এই চিন্তায় যেন মনে জোর আসে। তবু তাদের মুখের দিকে তাকানো'র এই আত্মপ্রকাশ—এই টেগোর-পূজার ভঙ্গিমা—এত ধিক্কারজনক। এমনি ধারা য়ুরোপই আরও পঞ্চাশ বৎসর ঢের ভাল"। Lady ottoline Morrelকে লিখিত পত্রে (24. 5. 1916) লরেন্স এই মন্তব্য করেছেন।

যুদ্ধকালীন য়ুরোপ এমনি করে টেগোরের প্রভাব থেকে নিজেকে স্পর্শশুচি রাখার চেষ্টা করছিল।

কিন্তু যুদ্ধের পর জার্মানীতে যে বিপুল নৈরাশ্য দেখা দিল তার মূল কথাটি দাঁড়ালো এই যে এই ধরণের আত্মঘাতী যুদ্ধে আর নয়। যা' হবার হয়ে গেছে। অর্থনৈতিক জীবনের মেরুদণ্ড তার ভেঙ্গে গিয়েছিল। যুদ্ধ উত্তেজনার শেষে মনে একটা স্বাভাবিক ক্লান্তি—এমন কোন বস্তুর প্রয়োজন সব হারিয়েও যাকে আঁকড়ে ধরে মানুষ একটু শান্তি পাবে। কিন্তু সেদিনের জার্মানীতে অথবা সমগ্র য়ুরোপে এমন কোন মানুষ জন্মাল না যে, তার বাণী দিয়ে, তার জীবনাদর্শ দিয়ে এইসব বিপর্যস্ত মনকে চাঙ্গা করে তুলতে পারে। না রইল রাজনৈতিক কড়া শ্লোগান, না রইল আদর্শে সম্বল।

এইসব সময়ে জাতির দুর্দিনে বাণী প্রচারকের সব চেয়ে বড় দায়িত্ব হচ্ছে জমি তৈরী করা। একটা সমগ্র জাতিকে আবার নূতন করে গড়ে ওঠার স্বপ্নে বিভোর করার জন্য একটা বহুবিস্তৃত আয়োজনের প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন বহু দূরদেশ থেকে। তাঁর পক্ষে এই অগ্রপ্রচার করা সম্ভবপর ছিল না। তবু জার্মানী তাঁকে একান্তভাবে গ্রহণ করেছিল। গ্রহণ করেছিল তাদের নূতন ধর্মগুরু হিসেবে। এসবের কারণ কি?

শুধু জার্মানীই নয়, ফরাসী দেশেও তাঁর সংবর্ধনা হয়েছিল প্রচুর। বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঋষি ও কবি হিসেবে তিনি বন্দিত হয়েছিলেন। রোমা রোঁলা, আঁদ্রে গাইভ, কাউন্টেস সেওয়ালিস, পল ভ্যালরী প্রমুখ শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীলরা তাঁর বাণীকে অন্তরের সঙ্গে সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। যদিও এখানে উল্লেখযোগ্য যে ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে সাধারণ পাঠক সমাজ যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে তাঁর কথা নিয়ে আলোচনা করত। সেখানে কবিকে নিয়ে একটা বিরাট হৈ চৈ করা হয়নি'। তার কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। রাজনৈতিক কারণ এর প্রধান কথা। কলোনীর বাসিন্দা—এই চিন্তায় তখনো তাদের শরীরে ঘৃণা জমত।

প্রাচীর বাণী

সব সত্ত্বেও যুদ্ধের পর বিপর্যস্ত য়ুরোপবাসীর কাছে রবীন্দ্রনাথ একটা মস্ত আশ্বাসরূপে দেখা দিলেন।

একজন ফরাসীর রচনায় তৎকালীন য়ুরোপের মনোবৃত্তি পরিষ্কার হয়ে দেখা দিয়েছে—

—"য়ুরোপের পিছন দিকে সেই মহাদেশ থেকে চিরদিনই এসেছে সেই সব বাণী যা প্রতীচ্যের সত্তাকে উত্তীর্ণ করেছে শীর্ষলোকে—ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর নূতন উদ্দীপনা যুগিয়েছে। মানব-সভ্যতার আঁতুড় ঘর—মননশীলতার বাসভূমি প্রাচ্যখণ্ড যেন চিরদিন রহস্যমন্থর স্তব্ধ চোখে চেয়ে দেখছে আর গুপ্ত করে রেখেছে প্রোজ্জ্বল ভবিষ্যের গুপ্তমন্ত্র। দু'হাজার বছর আগে প্রাচ্যদেশ থেকে এসেছিল সেই বাণী, বিনয়ের বাণী, সততার বাণী—যা চূর্ণমান রোমের বিরাটত্বের পুনর্গঠন করেছিল (Jean Guehenno: de Message de l'orient in La Pevece de Paris' 19. 1919. P. 80)

য়ুরোপের সব দেশের থেকে এক। জার্মানী প্রাচ্যদর্শন ও সাহিত্য নিয়ে অধিক আলোচনা করেছে। সেদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাদের কাছে মোটামুটিভাবে যথেষ্ট পরিচিত হয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গেই। নীটশে ও সোপেনহায়ারের প্রাচ্যধর্মী দর্শনতত্ত্বই পর্যুদস্ত জার্মানীর কাছে রবীন্দ্রনাথের বিপুল অভিনন্দনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখেছিল।

"রবীন্দ্রনাথের gentle philosophy নীটশের অগ্নিমন্ত্রকে ছাপিয়ে উঠেছে—যে অগ্নিমন্ত্র প্রাকযুদ্ধ জার্মানীকে রস জোগান দিয়েছিল। টেগোরের এই সাফল্য চমকপ্রদ। এ বছরের সেরা কাটতি তাঁর বইয়ের।......সব থেকে সস্তা বইয়ের দাম হোল পনের মার্ক আর তাঁর গ্রন্থাবলী আড়াইশ' তিনশ' মার্কও রয়েছে।" (The Advertiser, Adelaide, Australia, 11. 11. 1921)

বাহির বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ

১৯২১ সালের জুন মাসে রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম বার বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন সে এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখা দিয়েছিল।

—"আসনের জন্য ভীড়ের চাপে বহু মেয়ে মূর্ছা গিয়েছিল—অনেকেই জনতার চাপে পিষ্ট হয়েছিল।" (Daily News, London, 3. 6. 1921).

—"১৯২১ সালের গ্রীষ্মকালে জার্মান প্রকাশকরা আমেরিকায় কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড কাগজের অর্ডার পেশ করেছিল টেগোরের বই প্রকাশ করবার জন্য। এতে ত্রিশ লক্ষ বই ছাপা হয়।" (The Mail, Birmingham, 2. 9. 1921).

—"১৯২১ সালের অক্টোবরের মধ্যে আট লক্ষ বই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল।" (Evening Post, London, 21. 10. 1921).

এইসব ঘটনা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে রবীন্দ্রনাথ কি বিপুলভাবে জার্মানীর কাছে সমাদৃত হয়েছিলেন। এর পূর্বে কোনকালেই জার্মানী কবির সমাদর খুব করেনি'। এই সময়কার বিশিষ্ট কবিরা—রেইনার মেরীয়া, রিলকী, ষ্টিফেন জর্জ—এঁরা তখন মাত্র বিদগ্ধ জার্মান সমাজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে পরিচিত। সুতরাং এই টেগোর বন্দনার মূল কারণ কি তাই চিন্তা করে য়ুরোপের চিন্তাবিদরা হতাশ হয়েছিলেন। প্রথম দর্শনে যা' স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সে হচ্চে জার্মানীর প্রাচ্যধর্মিতার মোহাবেশ।

নীচেকার উদ্ধৃত অংশটুকু পড়লেই এই চিন্তাধারা ধরা পড়বে। এর মধ্যে তৎকালীন জার্মানীর এই মনোভাবকে কটু ব্যঙ্গ করা হয়েছে। কারণ জার্মানী যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যে অন্তরের শান্তি খুঁজছে অধঃপতিত প্রাচীর কাছে এ চিন্তাকে তারা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেনি'।

—"রাজনৈতিক কারণেই সম্ভবতঃ আজকের জার্মানীতে টেগোর

সব থেকে অধিক সমাদৃত। টেগোরের মিষ্টিক শীতলতা জার্মানীতে প্রলেপের কাজ করেছে। মিলিত শক্তিপুঞ্জের কাছে আগামী বৎসরের কোন সময়ে যুদ্ধ ঋণ শোধ করতে না পারার অক্ষমতার চিন্তা এবং দেশের মধ্যে রাষ্ট্রনেতা এবং রাষ্ট্রনীতির অভাবই এই নৈরাশ্যের প্রধান কারণ।" (Sunday Times, London, 18. 9. 1921).

জার্মানীতে রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনার বিপুল আড়ম্বরের দিকে তাকিয়ে আঁদ্রে গাইডের মত মনীষীও বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁর বিশ্লেষণও লক্ষ্য করবার বিষয়।

"জার্মানীর তারুণ্য য়ুরোপের দিকে পিছন ফিরে প্রাচীর পানে তাকাচ্ছে। এটা নিশ্চিত পুনরভ্যুদয়ের লক্ষণ। সব সময়ই জার্মান মনকে আত্মবিলোপ করতে হয়েছে, যাতে বিদেশ হ'তে সংযোজনী শক্তির অনুপ্রবেশের ফলে সে নিজের চিত্তের একত্ব খুঁজে পায়।" (Nouvelle Revue Francaese, 1. 11. 1921).

যখনই এই ভঙ্গী হয়েছে প্রবল অর্থাৎ যখনই প্রাচীন আদর্শবাদী স্বাদেশিকতার দাম্ভিকতায় তা' চাপা না পড়েছে তখনই জার্মানীর মন ফিরেছে রাশিয়ার দিকে অথবা তা' ছাড়িয়ে ভারত এবং চীনের দিগন্তের দিকে।

রবীন্দ্রনাথ যে জার্মানীতে এত বেশী সম্মান ও শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন তার কারণ হিসেবে আগেই বলা হয়েছে যে, সমগ্র য়ুরোপই কিছুদিন থেকে প্রাচীর আদর্শ ও জ্ঞানকে নূতন মাপকাঠিতে বিচার করছিল। এই বিচারের প্রয়োজনও হয়েছিল য়ুরোপে। কেন না সব দিক দিয়ে বর্তমান যুগের অগ্রণী দেশগুলি না পাচ্ছিল রাষ্ট্রিক শান্তি, না পাচ্ছিল পারস্পারিক মৈত্রীর বন্ধন। নূতন পাওয়া বিজ্ঞানের শক্তিমত্তায় তারা বারে বারে উন্মাদ হয়ে উঠছিল। কেবলমাত্র রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যে রাষ্ট্র-

পতিরা বিচলিত হচ্ছিলেন তা নয়—ঘরের ভিতরেও একাকী মানুষ এমন কোন বস্তু পাচ্ছিল না যা' তাকে মানুষী ধর্মের অতিরিক্ত কোন সঞ্চয় দিতে পারে। এইসব কারণে প্রাচীর আদর্শগুলি নিয়ে চুলচেরা বিচার হচ্ছিল। তাদের ভিতরকার সেই যথার্থ সত্যরূপটিকে আবিষ্কারের প্রচেষ্টা চলছিল। যুদ্ধে রিক্ত হয়ে তাই তারা যখন হতাশ হয়ে ঘরে ফিরল, কিছুই তাদের আর অবশিষ্ট রইল না। মনের ভিতরে কোন অদৃশ্য দেবতার অস্পষ্ট বাণী তাদের চঞ্চল কচ্ছিল—কোন না-বোঝা সত্যবাণী। রবীন্দ্রনাথ সেই চরম দুঃখের লগ্নে তাদের কাছে দৈববাণী শোনালেন—তাদের কানে দিলেন মানুষের মহৎ আদর্শের কথা। তারা প্রত্যেকে তার যথার্থ অর্থ নিরূপণ করতে পেরেছিল কিনা এ সম্বন্ধে সংশয় জাগে। কিন্তু তার অন্তর্নিহিত একটা সুর তাদের মনোবীণায় বেজেছিল নিশ্চয়ই।

গিলবার্ট মারে তাঁর একটি অপ্রকাশিত চিঠিতে এই কথাটিই লিখে-ছিলেন সাঁইত্রিশ সালে। তিনি বলেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের মনের সেই কথাটিই বলতে পেরেছেন যা আমরা কিছুতেই প্রকাশ করতে পারছিলাম না। শুধু এই কারণেই তাঁদের মন সাড়া দিয়েছিল।

পূর্বেই বলেছি যুদ্ধের পরে নূতন করে পুনর্বিবেচনার দিন এসেছিল। রবীন্দ্রনাথের রচনা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একজন ফরাসী ভদ্রলোক চমৎকার একটি কথা বলেছিলেন।

"যে কবি বিপুল একটা দেশে এতদিন প্রচুর খ্যাতি লাভ করেছেন —তাঁর নাম ইদানিংকাল অবধি য়ুরোপের কাছে অনাদৃত ছিল। এতে প্রমাণ হোল আমাদের মানব সমাজ সম্বন্ধে অজ্ঞতা। প্রমাণ হোল— আমাদের সভ্যতার ক্ষুদ্রতা—তার প্রাদেশিকতা। এই সব আদর্শ যে আমাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এই থেকে বোঝা যায় আমাদের য়ুরোপীয়

সভ্যতার ধারণার ভ্রান্তি। আজো আমরা উপলব্ধি করতে পারিনি' যে আমাদের আদর্শ থেকে ভিন্ন অন্য আদর্শের আওতায় কোটি কোটি মানুষ বাঁচে—পুষ্ট হয়।" (Jean Guehenno : Le message de L'Orient—Rabindra Nath Tagore. (In la Revue de Paris. 1 9 1919)

ইউরোপের সব সেরা সাহিত্যিকের সমকক্ষ একজন কবিকে যে ভারতবর্ষ পাঠাতে পেরেছে এতে য়ুরোপের মন স্বভাবতঃই ভারতের দিকে আকৃষ্ট হয়। এতদিনের পরেও ভারতের মাটী যে বন্ধ্যা হয়ে যায়নি এইটিই তাদের কাছে আশ্চর্য লাগছিল।

জার্মানী যতটা বিপুলভাবে টেগোরকে গ্রহণ করেছিল, বাকি য়ুরোপ ততখানি পারেনি একথা বলা চলে। তার অন্যতম কারণ বোধ হয় জার্মানীর মনে 'কলোনীর বাসিন্দা' এ চিন্তা ছিল না। প্রাচ্যদেশগুলিতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স বিশেষ করে কলোনী তৈরী করে এসেছে এর আগের আগের যুগে। সেই হিসেবে তাদের দেশের লোকের মনে এইসব প্রাচ্যদেশগুলির ছবি পোঁয়াটে ; অর্থাৎ পপুলার সিরিজের পুস্তকের ভিতর দিয়ে তার পরিপ্রেক্ষণী। সে দেশের মানুষের আচার-ব্যবহার আদিম যুগের এবং তাদের দেশে গেলে য়ুরোপের সুস্থ মানুষ বাঁচে না। এইসব কারণে তারা সন্ত্রস্ত হয়েই রবীন্দ্রনাথকে নিরীক্ষণ করছিল।

বিশেষ করে ফ্রান্সে এই মনোবৃত্তি হয় প্রবল। ফ্রান্সের দৃষ্টিভঙ্গীই হোল জাতীয়তাবোধ। ফ্রান্স সহজে ভূমধ্যসাগরের ওপার থেকে আসা কোন বাণীকে বিশেষ বিবেচনা না করে গ্রহণ করেনি'। বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সে এই সহজাত সংস্কারে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সুতরাং টেগোর সহজে সেদেশে জনসাধারণের মনে সিংহাসন পাননি'।

আগেই যেমন বলা হয়েছে য়ুরোপের কুরুক্ষেত্রের শেষে একটা

পরাজয়ী মনোবৃত্তি সকলের মধ্যেই এসেছিল। অনেক চিন্তাশীল ভাবছিলেন যে য়ুরোপের সভ্যতায় ভাঙ্গন ধরেছে এবং যে বস্তু ভাঙতে সুরু করেছে তার আশ্রয় আর নিরাপদ হবে কিনা। এই সন্দেহ মনোবৃত্তিরও পরিবর্তন ঘটায়। কেউ কেউ নূতন আদর্শের ভূমিতে নূতন করে বাঁচতে চাইছিল আর কেউ কেউ বা 'যেমন আছি নিজ বাসভূমে তেমনি থাকব' এমনি ভাবে চিন্তা করছিল। জার্মানীর মনোভাব সম্ভবতঃ প্রথম ধরণের। জার্ম্মানী ভেবেছিল পূর্ব থেকে এসেছে আবার সেই বাণী যা জার্মানীকে নব অভ্যুদয়ের আলো দেখাবে।

আর্ণেষ্টরিস তার রবীন্দ্রনাথের জীবনীতে এক জায়গায় লিখেছেন—"প্রকৃতি এবং জীবন সম্বন্ধে একটা নূতন বোধ পাব আমরা ভারতের এই দৃষ্টির ভিতর দিয়ে।" (Earnest Rhys : Rabindra Nath Tagore, 1915).

তাদের স্মরণে আসতে লাগল সেই সব ধর্মপ্রচারকের কথা যাঁরা দু'হাজার বছর আগে প্রাচ্যদেশগুলি থেকে এসেছেন য়ুরোপে বাণী প্রচার করতে। যে সব বাণী বারে বারে অসভ্য য়ুরোপবাসীকে নবজীবনের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছে—আত্মধ্বংসকারী যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করে বাঁচিয়ে রেখেছে। চিরকালই প্রাচ্য দিয়েছে জগৎগুরু। সুতরাং এবারেও প্রাচ্য থেকে এসেছে আবার নূতন বাণী—যা য়ুরোপের চেতনাকে নূতন বোধে ভাস্বর করে তুলবে।

এই পরাজয়ী মনোবৃত্তিরই একটা প্রকাণ্ড উদাহরণ হোল রবীন্দ্রনাথের সমাদর। এই মনোবৃত্তির ফলে রবীন্দ্রনাথ এক নিমেষেই তাদের চোখে হিমালয়ের মত বিরাট হয়ে উঠলেন। নিজেদের দিকে চেয়ে তাদের লজ্জাবোধ হ'তে লাগল। একজন অখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক বলেছেন—

—"রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভালবাসেন এবং ঘৃণা করেন। বৃহত্তর জগতের কাছে আমরা যে ছবি দেখাচ্ছি তা' অতি জঘন্য এ নিঃসন্দেহ।" (Edmond Jaloux, in Les Appels de l'Orient, 1925).

—"এও বেশ করে বুঝেছিলেন তারা যে য়ুরোপের যা জীবনের ভঙ্গী তা আর য়ুরোপকে বাঁচাতে পারবে না। কারণ য়ুরোপের নিজের সত্বাই মৃত্যুমুখী। য়ুরোপের বস্তুবাদ আর রণনীতি তার নিজের সমাধি-ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে।" (Leipziger Tageblatt, 1. 7. 1921).

—"টেগোর জার্মান সত্বাকে জাগ্রত করেছেন—আপন শক্তিতে আস্থা স্থাপন করতে সাহায্য করেছেন। কিন্তু জার্মানীর অন্তর থেকেই এ শক্তি আসবে। জার্মান সত্বাকে আবার সুস্থ হ'তে হবে তার নিজের শক্তিতে। তবু এই দুর্দিনে তিনি যে আমাদের পথ প্রদর্শন করেছেন, এর জন্য সমগ্র জার্মানীর কৃতজ্ঞতা তাঁর কাছে।" Prof. Eugen Kuchhnemann : Neue Hamburger Zeitung, 13. 1. 1922).

রবীন্দ্রনাথের রচনার ভিতর দিয়ে য়ুরোপে যে আবার একটা নব জাগৃতি এল, তার উল্লেখ প্রসঙ্গে এজরা পাউণ্ড বলেছিলেন—

—"রেঁনেসার পূর্বে সমগ্র য়ুরোপে যেমন করে আবার স্থিতি ফিরে এসেছিল তেমনি সম্ভবতঃ আবার আসছে। আমাদের যান্ত্রিক কলরবের মধ্যে সেই প্রবুদ্ধ শান্তির বোধ আমরা ফিরে পাচ্ছি।" Ezra Pound : in 'Fortnightly Review', March, 1913).

এইভাবে শুধু জার্মানীতেই নয়, সমগ্র য়ুরোপেই একটা—বিরাট গোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথকে নূতন ধর্মগুরু বলে গ্রহণ করেছিল। তার ঐ একটিই কারণ। য়ুরোপ শতধাবিচ্ছিন্ন হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে হিংসায় ফুলে উঠছিল। রবীন্দ্রনাথের শান্ত বাণী যেন তাদের

মানবমৈত্রীর নূতন মন্ত্র শেখাল। ওরা মনে করেছিল রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে পাওয়া প্রাচীর বাণী তাদের জীবনে আবার এনে দেবে শান্তি আর মৈত্রী—য়ুরোপ এবার কিছুদিনের মত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে।

কিন্তু আর একদল মনীষী ঠিক এই সময় প্রাচীর ঝাপটকে রোধ করবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠলেন। প্রাচীর বাণী য়ুরোপকে শান্তি দেবে না—দিতে পারে স্থবিরতা! কারণ য়ুরোপের সভ্যতা যৌবনের তপ্ততায় উদগ্র। সে ত বসে ধ্যান করতে পারে না। সে চায় সুন্দরী ধরণীর বরমাল্য। এবং তা আসবে বীরের কণ্ঠে। সুতরাং প্রাচীর ঐ ধ্যানমন্ত্র বরবাদ করতে হবে। য়ুরোপের জীবনের আদর্শ হোল কর্ম এবং ভোগ। প্রাচী শান্তি আর ত্যাগের পথে যতই এগিয়ে যাক্ সেই অপ্রত্যক্ষ ফললাভের আশায় য়ুরোপ তাকে অনুসরণ করবে না। তার প্রাপ্য সম্মানটুকু দিয়েই খালাস হ'বে। 'তোমরা মানব সভ্যতার আঁতুড়ঘর—সভ্যতার জন্মদাত্রী—বেশ, নিশ্চিন্তে বসে থাক। খাওয়া-পরা পাবে। কিন্তু তোমাদের যে সম্পদ তা' ভোগ করতে দাও আমাদের। কারণ আমাদের ভরা যৌবন—এখন ঐ বৈরাগ্যের বাণী শোনবার মনের অবস্থা আমাদের নয়।'

তাই প্রথম প্রশ্ন উঠল—

—"টেগোর উপলব্ধি করছেন না যে য়ুরোপ কর্মের মধ্যে তার অন্তরছন্দ খুঁজে পাবে—ভারত যেমন পায় তার ধ্যানের আসনে। আমাদের সংস্কৃতির ভিত্তি হোল একক স্রষ্টার কর্মে আর ভারতের দৃষ্টি সমাজের মধ্যে, প্রীতির বন্ধনে।......যে ঈশ্বরকে আমরা শক্তির ভিতর দিয়ে পাবার প্রয়াস করছি তা কি আমরা প্রাচীর কাছে পাব? তা আমরা পাব না। নিজেদের মধ্যেই তার সন্ধান করতে হবে।"[৮] (Vossische Zietung, 16. 10. 1921).

প্রাচীর বাণী

—"সন্দেহবাদী য়ুরোপের কাছে এ হোল এশিয়ার বাণী। য়ুরোপের প্রতিটি আধ্যাত্মিক বিপ্লব সন্দেহের মধ্যে শেষ হয়। আর সেই সন্দেহের মধ্য থেকে মাথা তোলে নূতন আলোড়ন—নূতন সত্য। য়ুরোপবাসী আমরা আজও তরুণ। এশিয়ার চেতনাকে আমরা শ্রদ্ধা করি—শ্রদ্ধা করি এশিয়ার এই পুণ্যশ্লোক বাণীবাহককে। কিন্তু এও আমরা উপলব্ধি করি যে চিরদিনই আমাদের নির্ভর করতে হবে য়ুরোপের সেই গতিশীল শক্তিমত্তায়।" (Austrian News paper 21.6 1921).

এই প্রশ্ন উঠবেই। কারণ য়ুরোপের সভ্যতা—তা' যতই আধুনিক হোক না কেন—তার অর্জন বড় কম নয়। মাত্র কয়েকটি শতাব্দীর মধ্যে য়ুরোপ অত্যন্ত নিম্নস্তরের জীবনপ্রণালী থেকে তার মানুষকে তুলে এনেছে অনেক উঁচুতে। সভ্যতার ইতিহাসে তার দান হয়েছে অতুলনীয়। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্মপ্রেরণায় এবং সভ্যতার প্রগতির পক্ষে বিপ্লবের পর বিপ্লবে সে একটা সমগ্র ভূখণ্ডকে নূতন জয় থেকে নূতনতর অভিযানে চালনা করেছে; বশ করেছে সারা পৃথিবীকে। বীরের মত ধরিত্রী সুভদ্রাকে অঙ্কশায়িনী করেছে। সুতরাং তার যে দম্ভ—তা' বীরের দম্ভ এবং তা' অশোভন নয়। য়ুরোপের এই সভ্যতাকে প্রাচীর নিঃশব্দ অগ্রসরের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে তারা যে ধুয়ো তুলবে, তা আশ্চর্য নয়। এশিয়া থেকে যদি আগের মত কোন বীর সেনানীর দল তরবারী হস্তে ধর্মপুস্তক নিয়ে য়ুরোপ আক্রমণ করত, তাহ'লে য়ুরোপ হয়ত তার সমগ্র শক্তিকে সংহত করে প্রত্যাঘাত করতে চাইত। কিন্তু টেগোর গিয়েছিলেন একান্ত নিরস্ত্র হয়ে। মাত্র কয়েকখানি তাঁর বই তখন য়ুরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাইতেই সমগ্র য়ুরোপে যে চাঞ্চল্য জেগেছিল তার একটা মোটামুটি ধারণা দেবার

চেষ্টা করা হয়েছে। এই নিরস্ত্র অথচ বিপুল শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে তারা অবিলম্বে জেহাদ ঘোষণা করলে। এই জেহাদের কড়া শ্লোগান হোল এই।

এশিয়ার কাছে ধার করা কোন বুলিতে য়ুরোপ তার লুপ্ত শান্তি ফিরে পাবে না—পেতে পারে না। কারণ এশিয়া জরাজীর্ণ—তার সমস্ত দেহমনে স্থবিরতা—বার্ধক্য। খৃষ্টান ধর্মের হোতা যদিও প্রাচ্য-দেশে জন্মেছিলেন কিন্তু তাই বলে প্রাচ্যদেশ তাঁর বাণীকে কোনদিন গ্রহণ করেনি। খৃষ্টান ধর্মের নির্দেশ যদি প্রত্যেক য়ুরোপবাসী মেনে চলে, অন্তরের শান্তি ফিরে পেতে তার বিলম্ব হবে না। য়ুরোপ যদি তার ঈশ্বরকে চায় তবে সে নিজের দিকেই ফিরে তাকিয়ে দেখুক। অত দূর প্রাচী-দিগন্তে সে কি দেখতে পাবে? কিছুই না।

এই সঙ্গে একজন মনীষী বলতে লাগলেন যে য়ুরোপের প্রধান শত্রু ভারত অথবা কোন প্রাচী দেশ নয়—সে হোল জার্মানী; কারণ ভারত হোল বহুদূরে এবং মাঝে মাঝে টেগোরের মত দু'একজন প্রচারক পাঠানো ভিন্ন ভারত আর কিছুই করতে পারে না। প্রাচ্যে য়ুরোপীয় সভ্যতা প্রচার যেমন অস্ত্রের ভিতর দিয়ে হয়েছে তেমনি কোন ভয় প্রাচীর দিক থেকে য়ুরোপের নেই। কিন্তু জার্মানী তার প্রাচ্য প্রীতির ভিতর দিয়ে, ভারতের বিষয় নিয়ে নানা শাখায় পুস্তক প্রণয়ন করে, নানা শাখা সমিতি স্থাপন করে সমগ্র য়ুরোপে একটা প্রাচ্য সভ্যতার বীজ বপন করছে এবং ক্রমশঃ এই প্রাচ্য উল্লেখ সমগ্র য়ুরোপের একটা আত্মঘাতী নেশা হয়ে উঠেছে। সুতরাং জার্মানীকে প্রথমে এই দিক দিয়ে সমঝানো প্রয়োজন। লরেন্স, পূর্বেই বলা হয়েছে, এই ধরণের প্রাচ্যপ্রীতিকে ঘৃণাকারজনক বলে উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর মনোবৃত্তিও ঠিক এই।

প্রাচীর বাণী

হেনরীমেস তাঁর একখানি বইতে ঠিক এই কথাই উল্লেখ করেছেন—"আসলে কাইসারলিং, হেরম্যান হেস, রোমা রঁলা—এই সব এশিয়াবাসী প্রচারকদের চেয়ে মোটেই কম সন্দেহজনক নন।" (Les Apples de l'orient).

এই সব চিন্তাবিদ্‌রা প্রচার করতে লাগলেন যে এই ধরণের প্রাচ্য ধর্মিতার প্রভাব এনে বিজিত জার্মানী বিজয়ী জাতিগুলির মনঃশক্তিকে নিবীর্য করবার চেষ্টা করছে।

মৌল সংস্কৃতির ক্ষেত্রে য়ুরোপীয় কৃষ্টিকে প্রাচ্যকৃষ্টি দিয়ে বিবর্ত্তিত করার ষড়যন্ত্র হোল জার্মানীর। ভারতের সংস্কৃতিকে আশ্রয় করে য়ুরোপ বাঁচবে না—সুন্দরের স্বপ্নে মগ্ন হয়ে যাবার যে মননশীলতা তা আমরা পুরানো গ্রীসের কাছে নিতে পারি—ভারতের কাছে কেন? সুতরাং 'গ্রীসে প্রত্যাবর্তন'—এই শ্লোগান দিয়ে এই প্রাচ্য ভাগীরথীকে রুদ্ধস্রোত কর। গ্রীসের কুশলতা হোল বস্তুরূপের নূতনত্বে—তার সুন্দর বিশ্লেষণীতে, তার পার্থিব বস্তুর ভোগাসুখে। প্রাচীর বৈশিষ্ট্য হোল নিষ্ক্রিয়তার বৈরাগ্য। এই দু'টানার মধ্যে পড়ে বিভ্রান্ত য়ুরোপ গ্রীসকেই আঁকড়ে ধরতে চাইল।

—"এ আমার স্থির বিশ্বাস যে, টেগোরের বাণীকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করলে য়ুরোপে আসবে মহা বিপর্যয়। তার অর্থ—য়ুরোপীয় সংস্কৃতির অধঃগতি। তবু একথাও সত্য, যে hellenistic চিন্তাপ্রণালী য়ুরোপের আত্মিক ঐতিহ্যে একদিন প্রধান ছিল—তার প্রগতির জন্য দায়ী—সেই চিন্তাপ্রণালীকে বরবাদ করতেই হবে আমাদের, যদি টেগোরের ধারণা সত্য হয়।" (New Zuricher Zeitung, 28. 5. 1921)

উপরে উদ্ধৃত অংশটুকু একটি জার্মান প্রধান সংবাদপত্রের। এই অধ্যায়ের গোড়াতেই উল্লেখ করা হয়েছে—সোপেনহায়ার ও নিটশের

প্রাচ্যধর্মী মতবাদ যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিল রবীন্দ্রনাথের বাণী তাতে ফসল ফলিয়েছিল। সুতরাং এই আপাতঃ-বিরোধী মনোভাবে প্রকাশ হচ্চে জার্মানীর চিন্তার দু'ধারা। রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করতে গিয়ে তারা নিজেদের দারিদ্র্যকেই বরখাস্ত করতে চেয়েছে। এটা ভারী কৌতুককর।

—"আত্মবোধের পক্ষে যদিও টেগোরের বাণী খুবই মূল্যবান্ এবং প্রয়োজনীয় তবু আমাদের এই দুঃখ থেকে বাঁচাতে পারবে না ভারতবর্ষ, কারণ ভারত আমাদের দেশ থেকে অনেক দূরে। আজ আমাদের বেশী প্রয়োজন একজন Fichte যিনি আমাদের জানেন। তবু সন্দেহ হয় —এই বিদেশী প্রাচ্যবাসীকে আজ যত সমাদর করা হচ্ছে, Fichte তার শতাংশও পাবেন কিনা।" (Das Kreuf, Berlin, 3.6.1921).

—"জার্মানীর চূর্ণমান সংস্কৃতিকে পুনরুদ্ধারের জন্য টেগোর আমাদের ধর্মগুরু হ'তে পারেন না—হ'তে পারেন না।"

এই ধরণের দু'মুখী মনোবৃত্তির জন্য জার্মানীতে রবীন্দ্র সংবর্ধনা এক সময় যেমন প্রবল হয়ে উঠেছিল, তার তাপও কমে গেল অতি সহজে। ধীরে ধীরে জার্মানী সারা য়ুরোপের রাজনৈতিক পুনর্গঠনের মধ্যে পড়ে আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগল। রবীন্দ্রনাথ যেমন সহসা তাদের ঘরের মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন তেমনি সহজেই আবার বিস্মৃতির লোকে চলে গেলেন। তাঁর মহত্তর বাণীকে গ্রহণ করার জন্য জার্মানী যে আসলে প্রস্তুত হ'তে পারেনি'—এই প্রমাণই হয়ে গেল।

জার্মানী ভিন্ন য়ুরোপের অন্যান্য দেশে রবীন্দ্রনাথ কোথাও অত প্রবল-ভাবে গৃহীত হননি'। সেখানে একজন বিরাট মনীষী হিসেবে তিনি সংবর্ধিত হয়েছেন—তাঁর রচনায় একজন কালজয়ী শিল্পীর আশ্চর্য লিপি-কুশলতার পরিচয় পেয়ে তারা মুগ্ধ হয়েছিল—তাঁর প্রতিভার বহুমুখী

প্রসারে তারা বিস্মিত হয়েছিল। তাঁর বাণীকে জাতিগতভাবে গ্রহণ করেনি' তারা। সমগ্র য়ুরোপেই এই রবীন্দ্র-বন্যা কমে গেলেও, রবীন্দ্রনাথ বেঁচে রইলেন একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ বলে—একজন সার্থক স্রষ্টা, সার্থক শিল্পী এবং জ্ঞানী মানুষ বলে।

তবে সমগ্র য়ুরোপের এই অযাচিত নিন্দা-প্রশংসায় ভারতের একটা মোটা লাভ হোল। সে এই যে, ভারত আর একটা কলোনীই শুধু রইল না—ভূ-পৃষ্ঠে একটা দেশ যাকে শুধু লুণ্ঠন করা চলে—এমনি সব ধারণাগুলো পরিবর্তিত হয়ে গেল। কারণ রবীন্দ্রনাথ সমগ্র য়ুরোপের চেতনাতে বিপুল একটা ধাক্কা দিয়ে তাকে জাগ্রত প্রাচীর দিকে ফিরিয়ে দিলেন।

সমালোচকের দৃষ্টিকোণে

নির্বাচিত বাংলা কবিতার ইংরেজী অনুবাদ যা পরে গীতাঞ্জলী নামে প্রকাশিত হয়েছিল, তার পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রনাথ লণ্ডন টিউবে হারিয়ে ফেলেন। বিখ্যাত স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দাগিরিতে সেগুলি যদি উদ্ধার না হোত এবং রবীন্দ্রনাথ যদি মত বদলাতেন তবে ভারতবর্ষকে আরো বহুদিন বিশ্বসম্মানের জন্য প্রতীক্ষা করতে হোত। গীতাঞ্জলীর কয়েকটি কবিতা ইংরেজীতে ভাষান্তরিত হয়ে প্রথম প্রকাশিত হয় এজরা পাউণ্ডের Poetry পত্রিকায় এবং সমগ্র গীতাঞ্জলী প্রকাশ করেন ইণ্ডিয়া সোসাইটি ১৯১২ সালে অক্টোবর মাসে। একথা আজ নিঃসংশয়ে বলা যায় যে গীতাঞ্জলী প্রকাশের পূর্বে রবীন্দ্রনাথের নাম ইংরেজী ভাষাভাষী সাধারণ্যে সম্পূর্ণ অপরিচিতই ছিল। তবু ইতিমধ্যেই ইংরেজী শিল্পী ও সমালোচক মহলে কবি যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সমসাময়িক কবি ও লেখকদের মধ্যে য়েটস, ষ্টাফোর্ড ব্রুক্, পাউণ্ড প্রমুখ শিল্পীরা কবির রচনার বিচিত্র সুরে বিমুগ্ধ হয়েছেন। ১৯১৩ সালের সমস্ত প্রকাশিত পুস্তকের একটা গোটা আলোচনায় বলা হয়েছিল যে এ বছরের শ্রেষ্ঠ বইগুলির মধ্যে গীতাঞ্জলী অন্যতম। (Book monthly Dec., 13).

রবীন্দ্রনাথকে ইংরেজী পাঠকমহলে পরিচয় করিয়ে দিয়ে য়েটস কবির সম্বন্ধে যে সব কথা উল্লেখ করেছিলেন তা এতো পরিচিত যে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবু য়েটস ও পাউণ্ডের মতো দুজন বিপরীতধর্মী কবি রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা করেছিলেন। তাঁদের প্রশংসার সুর

সমালোচকের দৃষ্টিকোণে

ভিন্ন হলেও একথা ঠিক যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে, তাঁর রচনায় এমন একটি শাশ্বতী সুর ছিল যা এই দুই বিরুদ্ধবাদী কবির মনে সমান অনুরণন তুলেছিল। পৃথিবীর সর্বদেশের সমসাময়িক শিল্পীরা তাঁর কাব্যের এই মহিমান্বিত দিকটিকে হৃদয়ঙ্গম করে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

গীতাঞ্জলি প্রকাশের পর এবং কবির বিশ্বসম্মান লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অনেক বই ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হতে থাকে।* সমগ্র য়ুরোপ আর একবার প্রাচীন প্রাচীর অন্ধকার দিগন্ত থেকে নূতন রবি-রশ্মির সংকেত পেল। সে রশ্মির প্রখরতা কম—স্নিগ্ধতা বেশী। এগুলি নিছক ভাববিলাসীর শূন্য যাত্রাও নয় আবার বাস্তবের পঙ্ককুণ্ডে আবদ্ধও নয়। বুদ্ধির ঝলকে দীপ্ত তরবারী নয়—তীব্র অনুভূতির এক একটি যুঁইফুল।

কবির এই সব কবিতা এবং কাব্যধর্মী রচনার সঙ্গে য়ুরোপের শুভ-দৃষ্টি হোল আসন্ন দুর্যোগের অন্ধকার গোধূলি-লগ্নে। একদিকে সেই গোধূলি আকাশে ঝটিকার থমথমে পূর্বাভাষ—সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে য়ুরোপ শান্তিরক্ষার বিপুল প্রয়াস করছে, অন্যদিকে মহাযুদ্ধের উদ্যোগ-পর্বে শিবিরে শিবিরে অস্ত্রের গোপন ঝনৎকার শোনা যাচ্ছে।

বিশেষ করে নূতন যন্ত্রশিল্পে আধুনিকতম হয়ে গ্রেট বৃটেন তখন পৃথিবীর সম্রাট হবার স্বপ্ন দেখছে। গীতি কবিতা এবং প্রাচ্যদর্শনের প্রতি সে তখন সম্পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে বসেছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিয়ে যে তুমুল স্তুতিনিন্দার আলোড়ন হ'বে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

অবশ্য এই সামান্য পরিসরে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনের সঙ্গে

* এই সব অনুবাদের একটি যথাসম্ভব সম্পূর্ণ তালিকা পুস্তকের শেষে দেওয়া হয়েছে।

বৃহত্তর বিশ্বের যোগাযোগের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয় জেনে আমরা কেবলমাত্র মুখ্য দৃষ্টিভঙ্গীগুলির বিশ্লেষণ করব।

রবীন্দ্র-মানস একান্তভাবে গীতধর্মী। কবির এই গীতধর্মী মানস তাঁর রচনার সর্বত্রই আপনাকে ব্যক্ত করেছে। গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে তিনি যে আশ্চর্য লিপিকুশলতার সঙ্গে লিপিত করে গেছেন তার বিশিষ্ট সুর সর্বমানবের মনে দেশকালের ব্যবধানকে উত্তীর্ণ হয়ে স্পর্শ করেই। প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় যোগ তাঁর চৈতন্যের। নিবিড় অনুভূতির প্রেরণায় তাঁর কাব্য অলোকপন্থী হয়েও কোথাও পাণ্ডুর বা বর্ণহীন হয়ে পড়েনি। মূলতঃ রবীন্দ্র-মানসের কাব্য-তরঙ্গের নানা স্তরে স্তরে এই অনুভূতির প্রত্যক্ষতা নানারূপে ও নানা মূর্চ্ছনায় সজীব হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রকাব্যের অনুধাবনে য়ুরোপীয় পাঠক ও সমালোচক মহল দুই ধরণেই সাড়া দিয়েছিল। লিরিক কবিতা এবং আধ্যাত্মিক কবিতা য়ুরোপীয় সাহিত্যে তখন অনেক কায়েমী আসন অধিকার করে বসেছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের এই সব গীতধর্মী কাব্য কেবলমাত্র গভীর ব্যঞ্জনা এবং আত্মিক অনুভূতির প্রাবল্যেই জোয়ার আনতে পেরেছিল সেদেশের ভাবগঙ্গায়।

'গীতাঞ্জলীর' সমালোচনায় যখন লেখা হোল—

"এইসব কবিতা যখন পড়ি, মনে হয় যেন আমাদের কালের কোন ডেভিডের ভজন পাঠ করছি আমরা। সম্ভবতঃ কেউ কেউ এই ভারতীয় কবির প্রভাব মুক্ত হবার চেষ্টা করবেন এই অজুহাতে যে এই কাব্যের মূল দর্শন আমাদের য়ুরোপীয় জীবনের ভাবদর্শন নয়। তবু আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে এর মূল মানসকে অবহেলা করার আগে নিজেদের প্রশ্ন করে জেনে নিতেই হ'বে যে আমাদের জীবনদর্শনের যথার্থ ভাব ও রূপ কি?" (Times Literary Supplement, Nov. '12).

তখন বিস্মিত হবার কিছু নেই।

মনে রাখা প্রয়োজন যে সমগ্র য়ুরোপীয় কাব্যে লিরিকের যুগ তখন অবসন্ন। আংগিকে নূতন প্রগতি আনছিলেন তরুণ কবিরা। কাব্য-রসিক পাঠকের মন গীতধর্মী কাব্য এবং বুদ্ধিশাণিত দৃপ্ত বাস্তববাদের কাব্য—এই দু'য়ের মধ্যে দোল খাচ্ছিল। এই সময় উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করা হোত যে মানব-সমাজের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সমাজগত এবং ব্যক্তিগত সর্বদিক দিয়ে একটা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী জাগ্রত করা প্রয়োজন। আধ্যাত্মিক অথবা অলোকপন্থী কাব্যে মানুষের বাস্তব জীবন যাপনের প্রতি যে কঠিন নির্বোধ্ অবহেলা তা অমার্জনীয়। এমনি যুগসন্ধিক্ষণে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের চিরন্তনী সুর আর একবার তাদের মনে গভীর অনুরণন জাগিয়ে তুলল।

"এইসব কবিতা সবশ্রেষ্ঠ ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে তুলনীয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। য়ুরোপীয় সাহিত্যের যে নূতন প্রগতি সুরু হয়েছে এরা তারই অগ্রদূত। যে য়ুরোপীয় সাহিত্য সংকীর্ণ সাহিত্য ও বুদ্ধি-বৃত্তির কঠোরতা থেকে মুক্ত হয়ে জীবনবেদ পুনরুচ্চারণ করছে—মানুষের দেবত্ব উদ্ঘাটিত করছে, এ হোল সেই সাহিত্যের সমধর্মী।" (The Irish Citizen, 1-11-13).

এঁরা হলেন সেই সব সমালোচক যাঁরা মনে করতেন যে মানুষের সভ্যতার ধারাবাহিকতায় একটা অবিনশ্বর সত্য আছে যা মানুষের মনকে মহান আদর্শ ও আধ্যাত্মিক আত্মোপলব্ধির দিকে গতিপ্রবণ করে।

অন্যদিকে বাস্তবধর্মী যাঁরা, তাঁরা এইসব কাব্যের প্রতি উদাসীনতা প্রকাশ করলেন। তাঁরা বলতে চাইলেন যে পৃথ্বীর সঙ্গে এইসব কবিতার কোন যোগ নেই—মাটির মানুষের জীবনে যে অসংখ্য দুঃখ-দারিদ্র্য এবং

ঘাত-প্রতিঘাতের বাস্তবতা আছে এসব কবিতায় তার কোন প্রত্যক্ষ প্রতিবিম্ব নেই। এসব কবিতা আদর্শবাদী এবং ধোঁয়াটে।

"রবীন্দ্রকাব্যে এমন একটা পাণ্ডুর ভাববিলাসিতা আছে যা সাধারণ পাঠকের চিত্তকে পীড়া দেয়"। (Church Times, July '25)

"রবীন্দ্রকাব্যে জীবধর্মের প্রতি কোন মৌলিক বাণী নেই"। (The Bookman, April '13).

এই প্রসঙ্গে আর এক শ্রেণীর সমালোচকদের উক্তিও উল্লেখযোগ্য। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে কিপলিংয়ের খ্যাতির তুলনা করে লিখেছিলেন—

"টেগোরের এই শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে একটি মূল কথা হোল এই যে ইংরেজী সাহিত্যের আর একটি শাখা ইতিমধ্যেই পুষ্পিত হয়েছে, যার বৈশিষ্ট্যকে আজো অবধি যথেষ্ট মর্য্যাদা দেওয়া হয়নি। এখন থেকে ইঙ্গ-ভারতীয় অর্থাৎ ফিরিঙ্গী কাব্যকে আর অবহেলা করা চলবে না, কারণ ইংরেজী সাহিত্যিকদের মধ্যে এই দু'জন মাত্র নোবেল পুরস্কার পেলেন"। (Birmingham Post, 6-12-13).

কবি য়েটস রবীন্দ্রনাথকে ইংরেজী সাহিত্যিক মহলে পরিচিত করে দিয়েছিলেন। তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা নিয়েও কুৎসা রটিয়েছিল লোকে। এই প্রশংসার পিছনে কেবলমাত্র যে গুণীর প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো হয়েছে তা নয়—এর মধ্যে স্বার্থপরতা লুকিয়ে আছে এমন ইংগিত দিতে তারা কার্পণ্য করেনি।

শুধু ওদেশে নয় এদেশেও সেদিন অনেকে রবীন্দ্রনাথকে 'ভারতের আইরিশম্যান' বলে অবজ্ঞা করেছিলেন। মনে রাখা প্রয়োজন যে এই সময় সমগ্র আয়র্ল্যাণ্ডে একটা নবীন যুগের গোড়াপত্তন হচ্ছিল কাব্যে। কবি য়েটস যে রবীন্দ্রনাথকে নিজের দলে নিয়ে সেই নব-

জাগৃতির শক্তিবৃদ্ধি করছেন—এ বিশ্বাস করার কারণ তাদের হয়েছিল।

"কবি য়েটসের এই প্রশংসা অর্থপূর্ণ। কেল্টের বৃত্তি বাঙালী মনোবৃত্তির সমধর্মী এবং প্রতিভার দিক দিয়ে বিচার করলে এই নূতন কবিকে ভারতের আইরিশম্যান বলে অভিহিত করা চলে। আধুনিক যুগ কেল্টিকের যুগ। বিজয়ী গ্রীসের মত এই সব কেল্টিক দেশ বিজয়ীদের বশ করেছে। আমাদের আইন রচনা করছেন লয়েড জর্জ আর আমাদের নাটক লিখছেন বানার্ড শ।" (The Pioneer, 3-11-13).

তারা এই বলে দেশী পাঠকের দিকে তর্জনী তুলে শাসিয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ভিতর দিয়ে প্রাচী নতুন কিছু দান করতে পারেনি য়ুরোপকে। ইংলণ্ডের কবিরা তাঁর চেয়েও সুন্দর করে আধ্যাত্মিক কবিতা রচনা করেছেন ইতিপূর্বেই।

"রবীন্দ্রনাথের অনেক পাঠক—বহু ইংরেজ পাঠকও হয়ত জানেন না যে টেগোরের কবিতার যা বাণী তা ইতিপূর্বেই সার্থকভাবে বলা হয়েছে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতায়। সার্থক এই কারণে যে সেগুলির বিস্তৃতি আরো বেশী এবং তাদের পটভূমিকা সমগ্র পৃথিবী। তাতে মানসিক বৃত্তি প্রবল, অধ্যাত্মবাদ কম।" (The Athenaeum, 8-5-15).

"যদিও টেগোরের কবিতায় প্রাচীন হিন্দু অধ্যাত্মবাদের মশলা কম এবং তাতে প্রাচীন অযোধ্যার চেয়ে নবীন প্যারীর সুগন্ধের ঝাঁঝ বেশী, তবুও এই সব কবিতায় ভাববিলাসিতা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ।' (The Nations—1913).

রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর গল্প ও উপন্যাস য়ুরোপীয় সাহিত্যের সভায় উপস্থিত করলেন, তখন ইংরেজী সাহিত্যে একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গী এসেছে। নূতন ভঙ্গীতে লিখছেন জয়েস, হাক্সলী, উলফ প্রমুখ সাহিত্যিকরা।

বাহির বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ

নূতন য়ুরোপীয় সাহিত্যের মধ্যে টলষ্টয়, ডষ্টয়ভেস্কীর ঐতিহ্য পূর্ণতা লাভ করেছে। এ ভিন্ন রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের স্তরে স্তরে য়ুরোপীয় মন নানাদিকে বিচ্ছুরিত এবং বেগবান। য়ুরোপের রাষ্ট্রগুলিতে নূতন রাজনৈতিক বোধ—য়ুরোপের মননশীলতায় বিচিত্র আলোড়ন এবং য়ুরোপীয় সভ্যতার নিজস্ব সংস্কার। সেই হিসেবে রবীন্দ্রনাথের রচনার পরিবেশ এবং আদর্শ সম্পূর্ণ ভিন্ন।

রবীন্দ্রনাথের গল্প, উপন্যাস বাংলাদেশের একটি বিবর্ত্তনের ইতিহাস। তাঁর রচনার উপজীব্যও তাই মধ্যবিত্ত গতিশীল বাঙালী সমাজ। ইংরেজী শাসনের শতাব্দী সঞ্চিত দুঃসহ বেদনা ধীরে ধীরে শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের চেতনায় গভীরভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করছিল। প্রাচীন সমাজের নানা ক্ষুদ্রতা ও বন্ধনী—নব জাগ্রত দেশাত্মবোধের গতিশীলতা, স্বাদেশিকতার নামে দেশের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের সংকীর্ণতা এবং বিপুল জাতীয় সত্বার আত্মবিকাশ—এই নানামুখী চেতনা দেশের মধ্যবিত্ত সমাজ মানসকে গভীরভাবে ঘা দিয়ে জাগ্রত করে তুলল। কবির চিত্ত সচকিত হয়ে উঠল। কোন কোন চিন্তাশীল সমালোচকের মতে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' এই নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের এবং সমাজ ও রাষ্ট্রচেতনার পরিবেশে রচিত প্রথম উপন্যাস। সমসাময়িক সর্বব্যাপী আবেষ্টনীকে বাদ দিয়ে 'গোরা'র সাহিত্যিক মূল্য নির্ধারণ করার চেষ্টা অত্যন্ত ভ্রান্তিপূর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক। কেবলমাত্র 'গোরা' নয় এই সময় রচনা করা রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধে এই ক্রিয়াশীল জাগরণের ছবি। তথাপি স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের রূপটি ঘটনাবহুল নয়, রাষ্ট্রীয় চেতনার দ্বারা মুহূর্তে মুহূর্তে দোলায়িত নয়। তাই রবীন্দ্র-উপন্যাসে ঘটনার গতি মন্থর। যতটুকু প্রতিঘাত দৃশ্যমান সেটুকু আদর্শের সংঘাতের ফলে।

সমালোচকের দৃষ্টিকোণে

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে রবীন্দ্রমানস গীতধর্মী। বাইরের ঘটনার দ্যোতনা কবির অন্তর্নিহিত কাব্য-মনকে কেন্দ্রচ্যুত করতে পারে না। অতীন্দ্রিয় রহস্যলোক—মানুষের মনের গভীর এবং সমাহিত ভাবলোক—সেখানেই কবির মন স্বচ্ছন্দ বিহার করতে পারে। 'এ গলিতে বাস মোর, তবু আমি জন্ম-রোমান্টিক।' কবির এই স্বীকৃতি তাঁর গভীর অন্তর্লোকের বাণীর প্রতিধ্বনি মাত্র। এই রোমান্টিক মনোবৃত্তি তাঁর সমগ্র উপন্যাস ও ছোট গল্পকেও গীতধর্মী করেছে।

এই পটভূমিকাকে স্মরণ করে রাখলে কবির গল্প উপন্যাসের ধর্ম ও প্রকৃতিকে অনুধাবন করা সহজ হয়।

য়ুরোপীয় গতিশীলতার পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের গল্প উপন্যাস তাই সানন্দ অভিনন্দন লাভ করল না। রচনার ভঙ্গী এবং বিষয়বস্তুর বিন্যাসকে নিয়ে সে দেশের পাঠক সমাজ প্রথমেই নিরাশ হোল।

'গোরার' সমালোচনায় লেখা হোল—

"বইখানি আমি বিশিষ্ট বলেই মনে করি।...টেকনিকের দিক থেকে বইখানি প্রাচীন।" (**Nation and Athenaeum, 9-2-29**)

"এই উপন্যাসটির মূলকথা হোল বর্ণ-বৈষম্য। প্রতীচ্যবাসী আমরা বর্ণ-বৈষম্য নিয়ে মাথা ঘামাই না।" (**Westminster Weekly, 23-2-24**).

রবীন্দ্র-উপন্যাস যে য়ুরোপে যথেষ্ট সমাদর লাভ করল না তার কারণ হিসাবে বলা চলে যে রবীন্দ্রকাব্যকে যেভাবে সেদেশে পরিচিত করানো হয়েছিল রবীন্দ্র উপন্যাসে তা করা হয়নি। ভারতবর্ষের সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর উপর রচনা করা এইসব উপন্যাসের মূল সুর সেদেশের পক্ষে সহজে গ্রহণ করাও সম্ভব হয়নি। এই কারণে য়ুরোপীয় সমালোচক মহলে রবীন্দ্র উপন্যাসের বিস্তৃত আলোচনা এড়িয়ে

গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর রচনাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রচয়িতাদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যে ভারতীয় দর্শন ও ভাবের যে বিশিষ্ট রূপ তারা প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিল রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের বিন্যাসে তা হয়নি।

এইসব কারণে সমসাময়িক য়ুরোপীয় সমালোচক মহলে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটা প্রতিভা-প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিতর্কের ঝড় ওঠে। কিপলিং, য়েটস, টলষ্টয়, ডষ্টয়ভস্কী, মেটারলিংক প্রমুখ প্রত্যেককেই এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ করানো হয়। রাশিয়ান সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রমানসের একটা আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা গিয়েছিল তখন। কারণ রাশিয়ান সাহিত্য প্রাচ্যধর্মী। কেউ কেউ তাঁকে ভারতের টলষ্টয় আখ্যা দেন।

"টেগোরের 'ঘরে বাইরে' ডষ্টয়ভস্কীর রচনার সঙ্গে তুলনা করা চলে। তার কারণ এই নয় যে, শিল্পী হিসেবে দু'জনের সাদৃশ্য আছে। একজন যদি গীর্জার অর্গান হন আর একজন বাঁশরী। যদিও ডষ্টয়ভস্কীর রচনায় খৃষ্টান ধর্মের পরিবেশ আরো বিস্তৃততর, তবু দু'জনেই প্রাচ্যধর্মী এবং আদর্শবাদী। মানব মনের পূর্ণদীপ্তি দু'জনের রচনাতেই জাজ্বল্যমান।" (The Church Times, 1-8-1916).

আর একদল চিন্তাবীর সমালোচক ভাবতেন যে রবীন্দ্রসাহিত্য অনুধাবন করলে রুশীয় সাহিত্যের মুখটি দৃষ্টিগোচর হবে। রবীন্দ্রনাথ যেন দাঁড়িয়ে আছেন চেকভ আর ডষ্টয়ভস্কীর মধ্যিখানে সেতুর মতো। যদিও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ডষ্টয়ভস্কীর কোন সমতা নেই বরং টলষ্টয়ের রচনার সঙ্গে কিছু কিছু সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ, তবু সাধারণ পাঠকের কাছেও এটুকু ধরা পড়ে যে রবীন্দ্রনাথ এইসব রুশীয় সাহিত্যিকের সান্নিধ্যে এসে বারে বারে দূরে সরে গেছেন তাঁর কাব্য-

ধর্মী মনের স্বাভাবিক জোয়ারে। তবু একথা চিন্তার যে এই ধরণের সাদৃশ্যবোধের মূল কারণ কি ?

রবীন্দ্রনাথের রচনায় ক্ষুদ্র স্বাজাত্যবোধ উত্তীর্ণ হয়ে মন বারে বারে বৃহৎ মানব সমাজের মাঙ্গল্যের সঙ্গে লীন হয়ে যায়। যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চেতনার ভাঙাগড়া নিয়ে এইসব উপন্যাসের কাহিনী নির্মিত সেগুলি তথ্যবহুল নয়, ঘটনার পারম্পর্যে ঝলকিত ত' নয়ই। নবজাগ্রত দেশের বিচিত্র মানস-দ্যোতনার মধ্যে প্রাত্যহিক গ্লানি ও আনন্দ-বেদনা বারে বারে আনন্দময়তার মধ্যে অসাধারণ হয়ে ওঠে। রবীন্দ্র-মানসের এই রোমান্টিসিজম গভীর অর্থ নিয়ে উপস্থিত হয় পাঠকের মনে।

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর উপন্যাস নিয়ে গেলেন তখন টলষ্টয় এবং ডষ্টয়ভস্কী নূতন রূপে আবিষ্কৃত হয়েছেন। যুদ্ধক্লান্ত, হৃত-সর্বস্ব য়ুরোপীয় জনসমাজ নূতন আধ্যাত্মিক বুভুক্ষায় উদগ্র। রুশীয় ঔপন্যাসিকদের যেসব চিন্তাধারাকে তারা অবজ্ঞা করে আসছিল নূতন বাস্তববাদের তাড়নায়—সেগুলি আবার নূতন অর্থে অর্থবান হয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথের যে রচনা যুদ্ধের পূর্বে ও মধ্যে ন্যাকামি, শূন্যগর্ভ আদর্শবাদ ও ধোঁয়াটে বলে উপেক্ষিত হয়েছিল—তারই মূল সুরটি সেদিনের মানুষের মনে আশ্চর্য অনুরণন তুলেছিল। কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথকে নূতন ধর্মপ্রচারক বলে গ্রহণ করেছিল ব্যক্তিগত জীবনে। সেকথা আগেই বলা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আরো একটা তুলনামূলক সমালোচনা উল্লেখ করা যেতে পারে। একদল সমালোচক রবীন্দ্রনাথ ও কিপলিংকে নিয়ে ঘোরতর আন্দোলন বাধিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে কিপলিংয়ের সঙ্গে তুলনা করার চেয়ে অমার্জনীয় অপরাধ বোধ হয় আর কিছু নেই। তবু এও রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে ঘটেছিল। তাঁর সাহিত্যকে ফিরিঙ্গী সাহিত্যের সম্মান (?) দেওয়া হয়েছিল।

কিপলিংয়ের ভারত আর রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবধান আকাশ-মাটী। কোনখানেই তা'দের দু'টি চিন্তাধারা ব-দ্বীপ রচনা করেনি'। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অবজ্ঞা ও উদাসীনতার জঘন্য পরিচয় দিয়ে গেছেন কিপলিং। কোথাও কোথাও বা ভারতবর্ষকে ছলনাময়ী দেশ বানিয়ে গেছেন। তার কারণ ইংলণ্ডে সেই সময় ভারত সম্বন্ধে এই ধরণের বইয়ের তাগিদ ছিল খুব। সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটে লেখক কিপলিং তাঁর প্রতিভার সব কৃতিত্ব এইভাবে ফুটিয়ে ও বিকিয়ে গেছেন তাঁর রচনায়। সুতরাং কিপলিং ও রবীন্দ্রনাথকে এক আসনে বসিয়ে বিচার করা শুধু ভুল নয়, স্বেচ্ছাকৃত বিকৃতি ও অমার্জনীয় অপরাধ।

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র সমালোচনায় বলা হয়েছে—

'এই উপন্যাসটি পড়ে কিপলিংয়ের 'Namgay Doola'র কথা অনেকের স্মরণে আসবে। দু'টি বইতেই দৃপ্ত স্বাদেশিকটি খাঁটি ভারতীয় নয়, দু'জনেই আধা-আইরিশ।' (Birmingham Gazette. 12-4-24).

এই তুলনামূলক আলোচনার শেষ কথা হোল এই যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে ফিরিঙ্গী সুর ইংলণ্ড শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল—রবীন্দ্র-রচনায় তার বিপরীত সুর। রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করে নবজাগ্রত প্রাচীর প্রতি দেশীয় জনসমাজকে চেতনাবান করতে দিতে তারা চায়নি'।

আর একটা উল্লেখযোগ্য দিক আছে আলোচনায়। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য জনসমাজের ও সভ্যতার যে মৌল ভিন্নমুখীতা তাই দিয়ে অনেক সমালোচক নিজেদের ঔদাসীন্যের কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। তাঁরা মনে ভাবেন যে 'প্রাচ্য প্রতীচ্য কোনদিনই মিলবে না।' কিপলিংয়ের এই 'অমর' বাণীকেই তারা চিরকালের সত্য বলে গ্রহণ করেছে। প্রাচ্য ভূখণ্ডে মানুষের জীবনের আনন্দ বেদনার ব্যঞ্জনা এবং সমাজ-জীবনের

সমালোচকের দৃষ্টিকোণে

নবজাগৃতিকে সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ না করার কৈফিয়ৎ সম্বন্ধে তাঁরা বলেছেন—

"এক সভ্যতার মৌলবাণী যদি আর এক সভ্যতার এত ব্যবধানে—সে ক্ষেত্রে এক দেশের সংস্কৃতির ঐতিহ্য আর এক দেশ থেকে কত অসম। নিজেদের অক্ষমতা স্বীকার করে আমরা আলোচনার যবনিকা নামাতে চাই।" (Daily News, 30-11-1925).

এইসব সমালোচক মনে করতেন যে প্রাচীর অলোকপন্থী চিন্তাধারাকে উপলব্ধি করতে যে পরিমাণ শ্রম ব্যয় করতে হবে তার উপযুক্ত পুরস্কার হয়ত পাওয়া যাবে না টেগোরের রচনা পাঠ করে। সুতরাং ক্ষান্ত দেওয়াই তাঁরা মনস্থ করেছিলেন।

"এই বইখানি আমরা তেমন মূল্যবান বলে সঞ্চয় করি যেমন করি একখানি পারস্যের কার্পেট অথবা জাপানী ছবি। এর রঙ মনোরম কিন্তু যেসব অদ্ভুত মূর্তি সূর্য্যালোকে অথবা বর্ষায় নৌকা বিহার করে কিংবা মৎস্য শিকারে যায়—তাদের ধ্যান-ধারণাকে উপলব্ধি করতে পারি না।" ('পলাতকার' সমালোচনায় Manchester Guardian, 15-11-1921).

আর পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে রবীন্দ্র উপন্যাসে প্রাচ্যের যে মাটীর সুর তা তাঁর গীতধর্মী কাব্যের নয়। বরং সাম্প্রতিক য়ুরোপের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের কর্মপ্রবাহ এবং বৈচিত্র্য তার মূলবস্তু। সুতরাং য়ুরোপীয় জনসমাজ যে স্বভাবতই নিরাশ হবে এ খুব আশ্চর্য নয়।

"রবীন্দ্রনাথ যদি যথার্থই পূর্বাশার কবি হন, সেক্ষেত্রে নগণ্য স্থানীয় রঙ ভিন্ন প্রাচীর দেয় আর কিছুই নেই। টেগোর প্রাচীর কোন মৌল বাণী বহন করে আনতে পারেননি', আমরা যা ঋণ দিয়েছি তাই পরিশোধ করতে এসেছেন।" (The Queen, London, 21.5.1921).

বাহির বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ

সেক্সপীয়র হতে সুরু হয়ে মোটামুটি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত য়ুরোপীয় নাটক একটি বিশিষ্ট ভঙ্গীতে লেখা হচ্ছিল। এই ধরণের নাট্যবস্তু আমাদের সংস্কৃত নাটকেও প্রচুর। সেক্সপীয়র ও অন্যান্য নাট্যকারদের বৈশিষ্ট্য ছিল ঘটনার বিন্যাসের ভিতর দিয়ে মানব-চরিত্রের জটিলতা ও মানব মনের ইন্দ্রিয় সংগ্রামকে রূপায়িত করা। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে য়ুরোপের নাট্যকাররা নূতন টেকনিক্ আবিষ্কার করলেন। তাঁরা বললেন যে ঘটনা পারম্পর্যের দ্বারা মানুষের মনের অগোচর সব ইন্দ্রিয় সংগ্রামকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মানুষের মনে একটা আকাঙ্ক্ষা আছে—সে অতীন্দ্রিয় লোকের ঐশ্বর্য অর্জন করতে চায়, বস্তুর সীমানা যেখানে শেষ তার পরেও যে কল্পজগত তা জয়ের স্বপ্ন দেখে। মনের এই প্রচ্ছন্ন আকুতিকে নাটকের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করা প্রয়োজন। সুতরাং প্রচলিত নাট্যভঙ্গীর বিষয়বস্তু ও ভাষাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে নূতন টেকনিক্ আনলেন তাঁরা।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের এই সংকেত রহস্যের অনুগামী লেখক। এই শ্রেণীর সার্থক নাট্যকারদের মধ্যে মেটারলিংক, ষ্ট্রাণ্ডবার্গ, আন্দ্রিফ এবং য়েটস অন্যতম। বাহিরের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতের জন্য ইন্দ্রিয়ের যে সংগ্রাম তাকে প্রকাশ করবার দায়িত্ব নিলেন তাঁরা, অরূপকে প্রত্যক্ষ করবার, অতীন্দ্রিয়ের আবেদন লাভের জন্য আত্মার যে নিরন্তর সংগ্রাম তাকেই সংকেতের সাহায্যে ফোটাবার চেষ্টা করলেন। স্বভাবতঃই এই ধরণের নাটকে ঘটনাস্রোত অতি মন্থর—গতি নাই বললেই চলে, এবং দর্শকের মন গভীরভাবে আত্মস্থ না হলে এই সংকেত নাটকের আবেদন বিফল হবার সম্ভাবনা।

অনেকে মনে করেন যে রবীন্দ্রনাথ এই সংকেত-সাহিত্যের টেকনিক্ পাশ্চাত্য নাট্য-গুরুদেবের কাছে পেয়েছিলেন। কিন্তু সেটুকু নাটকের

ছায়ামাত্র। নাট্যবস্তু তিনি ভারতের জীবনদর্শন ও ঐতিহ্য থেকে গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর সংকেত নাটক য়ুরোপীয় দর্শকের সামনে তুলে ধরলেন, তখন সারা য়ুরোপেই এই সংকেত নাট্যের প্রভাব শীর্ষ স্পর্শ করে ধীরে ধীরে অস্তাচলের দিকে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক য়ুরোপের মন রাজনৈতিক এবং আদর্শমুখী নাটকের সৃষ্টি সম্ভাবনায় উন্মুখ। এর কারণ য়ুরোপের রাষ্ট্রনৈতিক নব জাগরণ। এই সব কারণে রবীন্দ্রনাথের নাটক প্রথম দিকে য়ুরোপের মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করলেও তাদের আয়ু দীর্ঘ হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ যখন গেলেন, তখন য়ুরোপের রঙ্গমঞ্চে সার্থকভাবে অভিনীত হচ্ছে—**Oscar Wilder**এর **A woman of no importance**; **D' Annuncio**র **The Dead City**; **Maeterlinck**এর **The Blue Bird**; **Masefield**এর **Man**। এই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মঞ্চস্থ করলেন চিত্রা এবং সঙ্গে সঙ্গেই য়ুরোপের দৃষ্টি সম্পূর্ণ হয়ে পড়ল এই নূতন নাট্যকারের উপর।

য়ুরোপের এই ধরণের নাট্যকারদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মূল অসাদৃশ্য হোল এই যে রবীন্দ্রনাথের সংকেত নাটকে মূল বাণীটি সহজে প্রকাশিত, সেগুলি কেবল কথার জাল বুনানী নয়—প্রত্যেকটি কথাই চিন্ময়। কিন্তু ও-দেশের নাটকের সুর বাস্তব থেকে পলায়নী, সেগুলি স্বপ্নময় এবং রক্তহীন।

রবীন্দ্রনাট্যের রূপকের এবং পাশ্চাত্য নাটকের রূপকের ভাবধারার কতখানি পার্থক্য তার আভাষ পাওয়া যায় অজিত চক্রবর্তীর সমালোচনায়।

"মেটারলিঙ্কের Intruder পড়ি আর রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর পড়ি—

Intruderএ মৃত্যুর আগমনের যেসব রূপক দেওয়া হইয়াছে তাহা নিতান্তই বাহ্যিক, কখনো কখনো বালসুলভ কল্পনাত্মক! আজ কেমন শিরশিরে হাওয়া দিয়াছে, বাগানে মালীর কাস্তের কঁ্যাচ কঁ্যাচ শব্দ শুনা যাইতেছে, এসব সূচনার মধ্যে মৃত্যুর বাহ্যভীতির দিকটা আছে, তার গভীরতর মাধুরী নাই। ডাকঘরের মৃত্যু সমস্ত জীবনের বিচিত্র সৌন্দর্যকে সুদূরে বিলম্বিত করিয়া সেই সুদূরের আহ্বানকে মৃত্যুর আহ্বান করিয়াছে এবং 'তমসঃ পরস্তাৎ' মৃত্যুরাজকে বালসখা করিয়া তাঁর আবির্ভাবকে অত্যন্ত আনন্দময় করিয়া তুলিয়াছে।"

সমগ্র ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের ঋদ্ধির সুযোগ পেয়েছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথের নাটকে এই অরূপের ইংগিত এত প্রত্যক্ষ এবং এত মাধুর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সে ভিন্ন য়ুরোপীয় সমালোচক মহল এক কথায় রবীন্দ্র-নাথের সংকেত নাটককে—'ঘটনাহীন নাটক' বলে অবজ্ঞা করে দিয়েছিল। তার কারণ তখন প্রচলিত শ'য়ের নাটকের সঙ্গে তুলনা করে এই সব নাটককে অর্থহীন বলে বর্ণনা করা অসম্ভব নয়।

"এই নাটকের চরিত্রগুলি পাদপ্রদীপের সামনে এল গেল, কিন্তু নাটকের রূপায়নে, উদ্ঘাটনে অথবা বিন্যাসে কোন রস জমাতে পারলে না।" (রক্তকরবীর সমালোচনায় The Scotsman, Edinburgh, 23-7-25).

"'শ' এই বিষয়বস্তুটি নিয়ে একখানি যথার্থ প্রাণধর্মী নাটক গড়ে তুলতে পারতেন"। (চিত্রার সমালোচনায় The Bulletin, Sydney, Australlia, 17. 2. 925).

রবীন্দ্রনাথের নাটককে মধ্যযুগীয় গ্রীক নাটকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু এই ধরণের সমালোচনা ভ্রান্তিপূর্ণ। গ্রীক নাটকের আবেদন হোল ধর্মমুখী এবং তার সার্থকতা হোল জনসাধারণকে এই

ধর্মের দিকে অনুপ্রাণিত করা। রবীন্দ্র-নাটক ধর্মের পটভূমিকার উপর গড়ে উঠেছে বটে, তার চরিত্র রূপায়নে এই পটভূমিকা মহত্ব দান করেছে, কিন্তু কোথাও তা' ধর্মের নির্দেশবাণীকে নিয়ে গোঁড়ামিতে পর্যবসিত হয়নি। তার কারণ রবীন্দ্রকাব্যে এবং নাটকে যিনি অবাঙ্মানসগোচর পুরুষ তিনি কোন সংস্কারে বন্দী দেবতা নন—তিনি চিরন্তন এবং মুক্ত। তাই তাঁর আবেদনও সর্বমানবীয়।

একথা আজ নিঃসন্দেহে বলা চলে যে রবীন্দ্র-নাটকের চাহিদা য়ুরোপে এক সময় খুব বেশী হয়েছিল। য়ুরোপের প্রত্যেক দেশের রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্র-নাটক সার্থকভাবে অভিনীত হয়েছে। তাঁর সব নাটকের মধ্যে 'ডাকঘর' এবং 'রাজা' সম্ভবতঃ সেদেশে বেশী জনপ্রিয় হয়েছিল। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে বর্তমান মহাযুদ্ধে জার্মানীর আক্রমণে ফ্রান্সের পতন হয় যেদিন, সেদিন সংবাদপত্রে প্রচারিত হয় যে আত্ম-সমর্পণের সময় প্যারীর বেতারকেন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' অভিনয় করেছিল। এই একটিমাত্র ঘটনাই আজ প্রমাণ দেবে যে সেদেশের মানুষের কত গভীর অন্তঃস্থলে রবীন্দ্রনাথ আসন পেয়েছিলেন। জাতির ঘোর দুর্দিনেও তারা টেগোরকে স্মরণ করেছিল। 'টেগোরের বাণী' এক সময় সমগ্র য়ুরোপের সত্বাকে যেভাবে জাগ্রত করেছিল তার সাক্ষী এইসব ঘটনা। সময়ের দূরত্বেও সেসব অনুভূতি বিস্মৃতির গর্ভে লীন হয়ে যায়নি'।

বিদেশে রবীন্দ্রনাথ

[বিশ্ব পর্যটনার লোভ মানুষের চিরদিনের। কতটুকুর মধ্যে আমরা জন্মাই—আর মৃত্যুর পর আমাদের জন্য পাঁচ হাত জমিতে সমসাময়িক মানুষ কার্পণ্য করে। তাই বাঁচার মুহূর্তগুলিতে মানুষের আকাঙ্ক্ষা হোল দূরের। "ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী।" মানুষের ইতিহাসে যুগে যুগে এই দূর পাড়ি দেবার দুর্দমনীয় অভিলাষ প্রত্যক্ষ করা যায়। কেউ গেছেন কেবল মনের তাগিদে আর কেউ যান সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য। তাই একদল পর্যটক আর এক শ্রেণী দিগ্বিজয়ী।

রবীন্দ্রনাথও গিয়েছিলেন বিশ্ব পর্যটনায়। সমগ্র বাহির বিশ্ব তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করেছে। কারণ রবীন্দ্রনাথের মত কবিদের কাছে কাল শেষ হয় না আর পৃথিবী সান্ত। তাঁদের আমন্ত্রণ প্রত্যেক দেশের মানুষের অন্তরে। তাঁর আসন কালের ক্ষতিকে অস্বীকার করে।

তবু কবির বিশ্বপর্যটনার মধ্যে দিগ্বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা। সে আকাঙ্ক্ষায় লোভ নেই। তার কারণ চলতি কালের ইতিহাসে ভারতবর্ষ নামক দেশ বঞ্চিত, বুভুক্ষিত এবং ঈশ্বর-পরিত্যক্ত। সেই দেশের মাটিতে জন্ম নিয়ে কবির একটা নিজের তাগিদ ছিল বিশ্বের কাছে তাঁর নিজের মাতৃভূমিকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরা। কবির সমগ্র জীবনে সেই হোল সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। নরওয়ের বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক জোয়ান বয়ার তাঁর একখানি বই রবীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করে লিখেছেন—'সেই কবিকে, যিনি জাগ্রত প্রাচীর দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়েছেন'। এই

ইউরোপ

ইংলাণ্ড—১৮৭৮-৮০, ১৮৯০
১৯১২-১৩, ১৯২০-২১, ১৯২৬,
১৯৩০।
ফ্রান্স—১৮৯০, ১৯২০-২১ ১৯৩০।
জার্মানী—১৯২১, ১৯২৬, ১৯৩০।
রাশিয়া—১৯৩০।
অষ্ট্রীয়া—১৯২১, ১৯২৬।
চেকোস্লোভাকিয়া—১৯২১, ১৯২৬
যুগোস্লাভিয়া—১৯২৬।
বুলগারিয়া—১৯২৬।
রুমানিয়া—১৯২৬।
গ্রীস—১৯২৬। নরওয়ে—১৯২৬।
সুইডেন—১৯২১।
ডেনমার্ক—১৯২১, ১৯২৬।
বেলজিয়াম—১৯২০।
হল্যাণ্ড—১৯২০। সুইজারল্যাণ্ড
—১৯২১, ১৯২৬। ইটালী—
১৮৯০, ১৯২৫, ১৯২৬।

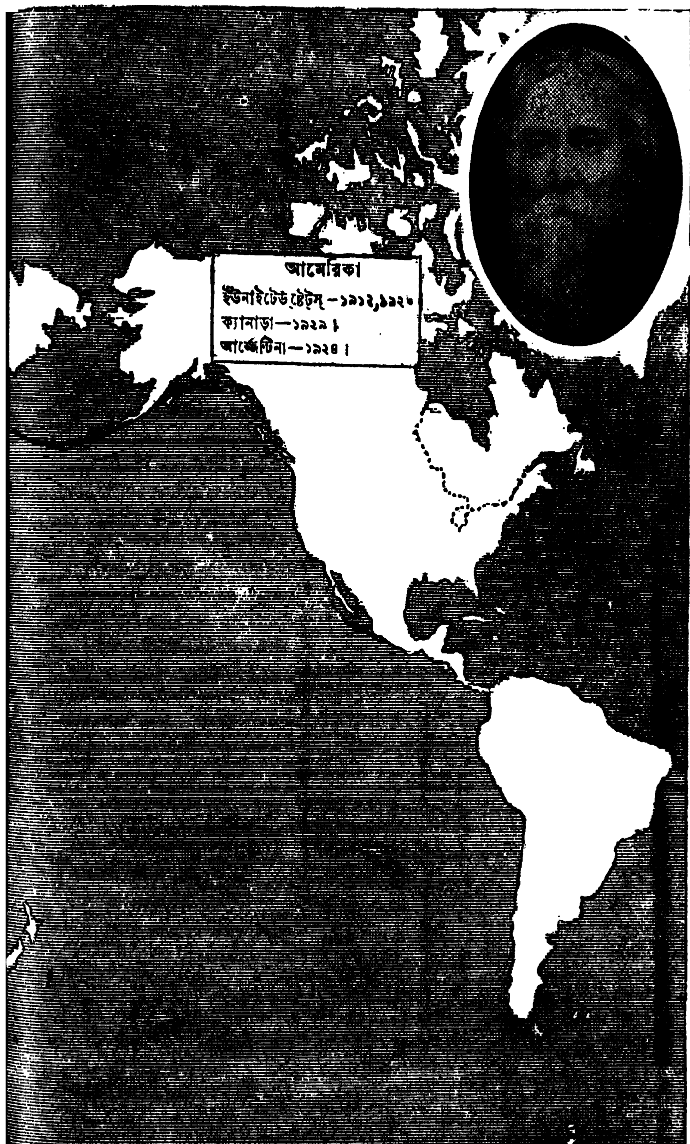
এসিয়া

জাপান—১৯১৬, ১৯২৪, ১৯২৯।
চীন—১৯২৪। ব্রহ্মদেশ—১৯১৬।
মালয়—১৯২৭। থাইল্যাণ্ড—
১৯২৭। জাভা—১৯২৭। বালি—
১৯২৭। সুমাত্রা—১৯২৭।
সিংহল—১৯২৮। ইন্দো-চীন—
১৯২৯। ইরাণ—১৯৩২।
ইরাক—১৯৩২।

ভারতবর্ষ

আফ্রিকা

মিশর—১৯২৬।


আমেরিকা
ইউনাইটেড ষ্টেট্স্—১৯১২,১৯২০
ক্যানাড়া—১৯২৯।
আর্জেন্টিনা—১৯২৪।

বিদেশে রবীন্দ্রনাথ

একটি কথায় রবীন্দ্রনাথ জয়মাল্য পেয়েছেন—লাভ করেছেন একটা স্বাধীন জাতির সশ্রদ্ধ প্রণাম।

রবীন্দ্র পর্যটনার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। এই বিবরণীর ভিতর দিয়ে কেবলমাত্র কবির ভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণ যে পাওয়া যাবে তা নয়—সমসাময়িক রাজনৈতিক পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ কিভাবে আলোচিত হয়েছিলেন এবং বন্দিত হয়েছিলেন তারও একটা ছবি পাওয়া যাবে।]

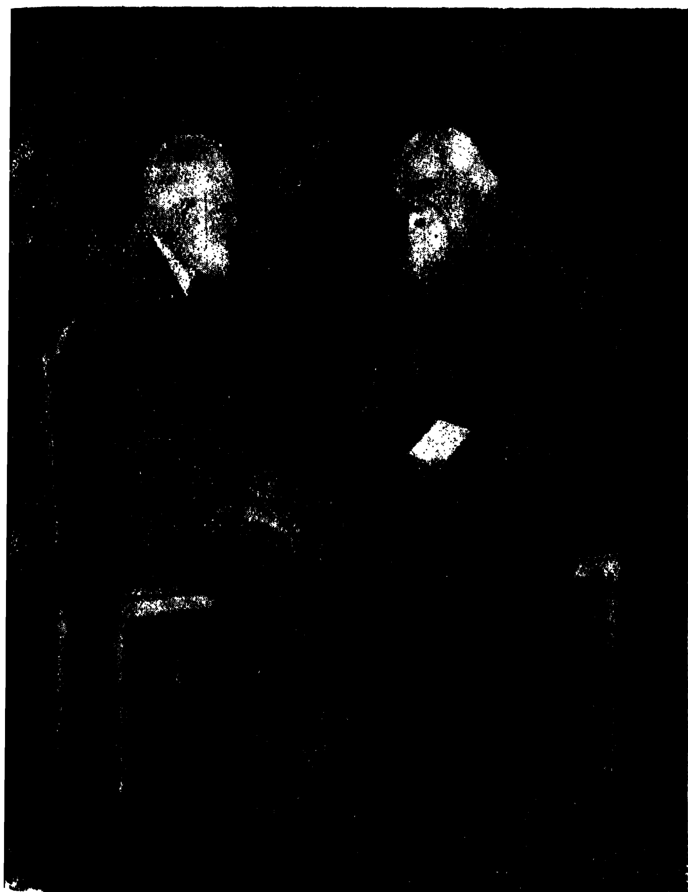
১৮৭৮—ইংলণ্ডের পথে:—২০শে সেপ্টেম্বর পুনা জাহাজে বিলাত যাত্রা; পথে এডেন, সুয়েজ, আলেকজেন্দ্রিয়া হয়ে ব্রিন্দিসি—ব্রিন্দিসি থেকে প্যারিস এবং সেখান থেকে ৫ই নভেম্বর লণ্ডনে উপস্থিতি। প্রথমে ব্রাইটনে একটি স্কুলে ভর্তি হন—ব্রাইটন থেকে পুনরায় লণ্ডনে এসে ইউনিভার্সিটি কলেজে যোগদান করেন—Prof. Henry Morley ও পরে Prof. Barker ও Dr. Scottএর নিকট ইংরেজী সাহিত্য অধ্যয়ন; ব্রিটিশ মিউজিয়মের নিয়মিত ভিজিটর—জন ব্রাইট ও গ্ল্যাডষ্টোনের বক্তৃতা শ্রবণের জন্য কয়েক বার পার্লামেণ্টে গমন—ডিভনশিয়রে টার্কিনগরে মেজ বৌঠাকুরাণীর সহিত কিছুকাল অবস্থান—পুনরায় লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন ও ১৮৮০ সালের শেষের দিকে ভারতে প্রত্যাগমন।

১৮৯০—ইংলণ্ডের পথে:—২২শে অগাষ্ট পুনরায় বিলেত যাত্রা; এডেনে জাহাজ বদলী করে আইওনিয়া দ্বীপাবলীর মধ্য দিয়ে ব্রিন্দিসি; সেখান থেকে ইতালীর মধ্য দিয়ে, আল্পস পর্বতের বিখ্যাত সুড়ঙ্গ সিনিস্ পার হয়ে প্যারী—প্যারী থেকে লণ্ডন—৪ঠা নভেম্বর ভারতে প্রত্যাবর্তন।

১৯১২-১৯১৩—ইংলণ্ডের পথে:—তিনি মার্সাইতে নেমে

ফ্রান্সের ভিতর দিয়ে, ডোভার অতিক্রম করে ১৬ই জুন তৃতীয়বার ইংলণ্ডে আগমন করেন। লণ্ডনে কয়েকদিন হোটেলে থাকার পর হ্যাম্পষ্টেড্ হীথ্এ ২নং হলফোর্ড রোডে এক বাসায় রোদেনষ্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি প্রদর্শন; রোদেনষ্টাইনের গৃহে আইরিশ কবি য়েটস, ইংরেজ কবি মেসফিল্ড, আরনেষ্টরিস, কুমারী সিনক্লেয়ার, এভেলিন আণ্ডারহিল, ট্রেভেলিন, এজরা পাউণ্ড, ও মিন্সাল পরিবারের সহিত পরিচয়। Union of East and West Club কর্তৃক প্রথম সংবর্ধনা; কবির সহিত নেভিনসন্, এইচ. জি. ওয়েলস, কেম্ব্রিজের বাংলা অধ্যাপক জি. ডি. আণ্ডারসন, হ্যাভেল, আরন্লড প্রভৃতির সহিত পরিচয়; টোকাডেরো হোটেলে নেশন পত্রিকার স্বত্বাধিকারীদের কবি সংবর্ধনার আয়োজন ও তখনকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কবির পরিচয়। ষ্ট্রাফোর্ডশায়ারে বাটাটন গ্রামে সিপাহীবিদ্রোহ যুগের বিখ্যাত জেনারেল আউট্রাম পরিবারে আতিথ্য গ্রহণ; সেখান থেকে গ্লষ্টারসায়ারে চ্যালফোর্ড গ্রামে কয়েকদিন অবস্থান; লণ্ডনে ফিরে এসে ওয়েলস, ষ্ট্র্যাফোর্ডব্রুক, বার্ণার্ড শ, জন মেসফীল্ড, লোয়েস, ডিকিন্সন, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, জন গলসওয়ার্দি, রবার্ট ব্রিজ, ষ্টার্জমুর প্রভৃতি মনীষীর সহিত সাক্ষাৎকার। লণ্ডনে প্রথম এণ্ড্রুজের সহিত পরিচয়।

আমেরিকায়—আমেরিকা যাত্রা এবং ২৭শে অক্টোবর নিউইয়র্কে উপস্থিতি; আর্বানায় (ইলিনস) গমন; কয়েকস্থানে একেশ্বরবাদীদের গীর্জায় **metaphysical** বিষয়ে বক্তৃতা; ১৩ই জানুয়ারী আর্বানা ত্যাগ ও সিকাগো যাত্রা; এখানে **Mrs. Vaugn Mody**র আতিথ্য গ্রহণ; সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে **"Ideals of ancient civilisation of India"** সম্বন্ধে বক্তৃতা; এছাড়া য়ুনিটেরিয়ানদের হলে **"Problem of evil"** সম্বন্ধে বক্তৃতা; রচেষ্টারে উদার ধর্মমতীদের সভায় যোগদান; বিখ্যাত



রবীন্দ্রনাথ ও বার্নার্ড শ'

জার্মান দার্শনিক রুডলফ অয়কেনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ; ৩০শে জানুয়ারী কংগ্রেস মঞ্চে Race conflict সম্বন্ধে তাঁর প্রসিদ্ধ বক্তৃতা ; বোষ্টনে গমন এবং বহু মনীষীসভায় বক্তৃতা ; নিউইয়র্ক ও সিকাগো পথে পুনরায় ১০ই মার্চ আর্বানায় প্রত্যাবর্তন ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বক্তৃতা।

ইংলণ্ডে :—১৯১৩ জুন মাসে পুনরায় বিলাতে আগমন ; লণ্ডনে কাকস্টন হলে সিকাগো ও হার্ভার্ডে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি মার্জিত ও পরিবর্ধিত করে পাঠ ; অর্শরোগের জন্য Duchess Nursing Home হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ ; ৪ঠা সেপ্টেম্বর City of Lahore জাহাজে ভারত যাত্রা ; ৬ই অক্টোবর কলিকাতায় উপস্থিতি ।

১৯১৬-১৭—জাপানের পথে :—৩রা মে জাপান যাত্রা ; ৬ই রেঙ্গুনে উপস্থিতি ও বিপুল সংবর্ধনা ; ১০ই যাত্রা করে ১৫ই সিঙ্গাপুরে আগমন ; ২২শে মে হংকং থেকে সোজা জাপান যাত্রা ; ২৯শে মে কোবে বন্দরে উপস্থিতি ; জাপানীজ প্রেস এ্যাসোসিয়েশান কর্তৃক প্রথম সংবর্ধনা, তারপর বহু মনীষীদের সভায় কাউণ্ট ওকুমার জাপানী ভাষায় অভিনন্দন পাঠ ও কবির বাংলায় উত্তর ; বিখ্যাত চিত্রশিল্পী হারার অতিথি হিসেবে হাকানেতে কিছুদিন অবস্থান ; ১৬ই জুন টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে "The message of India to Japan" এবং জুলাই মাসে Keio Gijuku বিশ্ববিদ্যালয়ে "The Spirit of Japan" সম্বন্ধে দু'টি বক্তৃতা পাঠ, জাপানের সাম্রাজ্যবাদী পলিসির সমালোচনা ও রাজরোষ আকর্ষণ ; কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে যাওয়ার আমন্ত্রণ কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডায় যতদিন না তাঁর স্বদেশবাসীর প্রতি উপযুক্ত ও সম্মানজনক ব্যবহার করা হবে, ততদিন ঐ দুই দেশের মাটি মাড়াবেন না বলে ঐ নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান ।

আমেরিকায় :—সেপ্টেম্বরের গোড়াতে জাপান হ'তে আমেরিকায়

যাত্রা ও ১৮ই সেপ্টেম্বর সিঅটেলে (ওয়াশিংটন) উপস্থিতি ; বিখ্যাত লেকচারবুরো পণ্ড লিসিয়ামের অন্যতম কর্তা মিঃ জেমস বি পণ্ডের সহিত সাক্ষাৎকার ও তাঁর সঙ্গে যুক্তরাজ্যে বক্তৃতা দেওয়ার একটা চুক্তি করণ ; সিঅটেল সানসেট ক্লাবের মহিলাবৃন্দের দ্বারা প্রথম রবীন্দ্র সংবর্ধনা ; এই ক্লাবের ঘরেই ২৫শে সেপ্টেম্বর পণ্ড লিসিয়ামের অন্তর্গত The Cult of Nationalism সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বক্তৃতা—পাশ্চাত্য-দেশের গৃধ্নু সাম্রাজ্যবাদের বিরূপ সমালোচনা ও ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রচুর নিন্দাবাদ ; অরিগন ষ্টেটের পোর্টল্যাণ্ডে ২৭শে সেপ্টেম্বর পরবর্তী বক্তৃতা ; ৩০শে কালিফোর্নিয়ার সানফ্রান্সিস্‌কোতে বক্তৃতা ; আমেরিকার একদল সংবাদপত্রের Nationalism সম্বন্ধে বক্তৃতার কঠোর সমালোচনা ; ৩রা অক্টোবর আমেরিকা প্রবাসী জাপানীদের একটি বিশেষ সভায় কবির বক্তৃতা ; পরদিন Los Angles'র জনসাধারণ কর্তৃক কবির সংবর্ধনা ; বেহালাবাদক Paderewski'র কনসার্ট শ্রবণ ও তাঁর সঙ্গে আলোচনা ; কলম্বিয়া থিয়েটারে তাঁর ছোট গল্প ও রাজার অনুবাদ পাঠ ; হিন্দুস্থান গদরপার্টির অন্যতম সদস্য রামচন্দ্রের সংবাদপত্রে কবিকে আক্রমণ ; গদরপার্টি কর্তৃক কবিকে হত্যা করার গুজব রাষ্ট্র ; Saint Barbaraয় গমন ও ন্যাশানালিজম সম্পর্কিত বক্তৃতার পুনরাবৃত্তি—তারপর কবির পাসাদেনা, সল্টলেক সিটি, সিকাগো, আইওয়, মিলবৌকি, লুইসভিলা, ডেট্রইহাট প্রভৃতি স্থানে ক্রমান্বয়ে বক্তৃতা দান ; ক্লিভল্যাণ্ডের Twentieth Century Clubএ আমেরিকাবাসীদের স্বর্ণমোহের নিন্দাবাদ , নিউ-ইয়র্কে প্রত্যাবর্তন ; প্রেসপ্রতিনিধিদের নিকট পাশ্চাত্য ন্যাশানালিজমের নিন্দা এবং আমেরিকার এ্যান্টি-এশিয়াটিক policy'র কঠোর সমালোচনা ; নিউইয়র্কের কারনেগী হলে, ফিলাডালফিয়া ও পুনরায় নিউইয়র্কে "The

world of personality" সম্বন্ধে বক্তৃতা ; বোষ্টনে Mount Halyoak Collegeএ Art সম্বন্ধে বক্তৃতা ; Tremont Templeএ Nationalism'র উপর বক্তৃতা ও প্রচুর সম্মান লাভ ; Yale Universityতে President Hadley'র সংবর্ধনা ; নিউইয়র্কে পুনঃপ্রত্যাবর্তন, ১২ই ডিসেম্বর Amsterdam Theatreএ বিদায় বক্তৃতা : সেক্সপীয়র উদ্যানে বৃক্ষ রোপণের জন্য Cleavelandএ গমন ; Coloradoতে উষ্ণ প্রস্রবণ দর্শন ; San Franciscoতে পুনরাগমন ও Paul Richard'র "To the Nations" পুস্তকের ভূমিকা লিখন ; ২১শে জানুয়ারী ১৯১৭ জাপান যাত্রা ; পথে একদিন হনলুলুতে অবস্থান—১৭ই মার্চ কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন।

১৯২০—ইংলণ্ডে :—১৫ই মে ইংলণ্ড গমন উপলক্ষে বোম্বাই ত্যাগ ; ৫ই জুন প্লিমাউথে উপস্থিতি ; পীয়ারসনের সংবর্ধনা ; লণ্ডনে এসে রোদেনষ্টাইন, হাডসন (author of Green Mansion) ; ফক্স-ষ্ট্রেঞ্জওয়েজ (author of the Music of Hindusthan) ; কানিং-হ্যামগ্রেহাম (author of Cartegena) ; রাশিয়ান চিত্রকর Nicholas Poverich, বার্ণাড শ, গিলবার্ট মুরে ও অন্যান্যদের সহিত সাক্ষাৎকরণ ; অক্সফোর্ড ছাত্রসভায় বক্তৃতাদানের জন্য গমন (১৯ জুন) ; Col. Lawrence'র সহিত সাক্ষাৎ ; কেম্ব্রিজ গমন ; Prof. Anderson, Lowes Dickinson ও J. M. Keynes'র সহিত সাক্ষাৎ ; East and West Society কর্তৃক সংগঠিত কবি সংবর্ধনায় যোগদান ; বিখ্যাত ইংরেজ অভিনেত্রী Sybil Thorndyke কর্তৃক এই বিশেষ উপলক্ষে লেখা Laurence Binyon'র কবিতা পাঠ। মণ্টেগু ও লর্ড সিংহের সহিত সাক্ষাৎ ও জালিওয়ানাবাগ হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আলোচনা ; Lord Chelmsford'র স্থানে মণ্টেগুকে ভাইসরয় নিযুক্ত

করবার জন্য প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জকে প্রেরিত চিঠিতে স্বাক্ষর ; ব্রিষ্টলে রামমোহন সমাধিমন্দির দর্শন ; Sir Horase Plunket ও George Russell'র সহিত সাক্ষাৎকার।

ফ্রান্স—(১৯২০, ৬ই অগাষ্ট) প্যারিস গমন ও M. Kahuর অতিথিরূপে অবস্থান ; অধ্যাপক সিলভ্যা লেঁভি ও De Brun'র সহিত সাক্ষাৎ ; উত্তর ফ্রান্সে যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন ও ধ্বংসলীলা সন্দর্শনে ব্যথিত ; কিছুদিনের জন্য দক্ষিণ ফ্রান্সে গমন ; পুনরায় প্যারিস প্রত্যাবর্তন ও বিখ্যাত কবি Comtesse de Noailles'র সঙ্গে পরিচয়।

হল্যাণ্ড—নিমন্ত্রিত হয়ে হল্যাণ্ড গমন ; Hague, Leyden, Utrecht প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা দান ও প্রচুর সম্মান লাভ।

বেলজিয়াম—বেলজিয়ামের Brusselsএ গমন ও রাজা কর্তৃক সংবর্ধনা ; Antwerp থেকে পুনরায় প্যারিসে প্রত্যাগমন। লণ্ডনে ফিরে এসে পুনরায় আমেরিকা যাত্রা ও ২৮শে অক্টোবর নিউ ইয়র্কে উপস্থিতি।

আমেরিকা—(১০ই নভেম্বর) ব্রুকলীনের সংগীত ভবনে "The meeting of West and East" বিষয়ে বক্তৃতা ; (১২ই নভেম্বর) ফিলাডালফিয়ার Brenmer সহরে মেয়েদের একটি কলেজে "বাংলার মরমী কবি" সম্বন্ধে বক্তৃতা দান ; (১৩ই নভেম্বর) প্রিন্সটনে ফুটবল খেলা দর্শন ও নিউইয়র্কে ন্যাশানাল আর্ট ক্লাবের পঞ্চদশ বার্ষিকী উৎসবে উপস্থিতি। (২০শে নভেম্বর) নিউইয়র্কে "The poet's religion" সম্বন্ধে বক্তৃতা ; ব্রিটিশ বিরোধী মনোবৃত্তির অন্তরালবর্তী সরকারী প্রতিবন্ধকতায় বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহের সকল চেষ্টা ব্যর্থ ; Poetry Society of New York কর্তৃক অনুষ্ঠিত অভিনন্দন সভায় কবির মনের ক্ষুব্ধতা প্রকাশ ; ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯২০ সিকাগো



রবীন্দ্রনাথ ও সীল্‌ভাঁ লেভি

গমন ও Mrs. Mody'র আতিথ্য গ্রহণ; টেকসাসে ভ্রমণ; ১৯শে মার্চ, ১৯২১, পুনরায় ইউরোপ যাত্রা।

ইংলণ্ড—(৮ই এপ্রিল) লণ্ডনে "পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন" বিষয়ে বক্তৃতা;

ফ্রান্স—তিন সপ্তাহ পরে প্যারিস গমন ও M. Kahuএর আতিথ্য গ্রহণ; ১৭ই এপ্রিল রোমা রঁলার সহিত সাক্ষাৎ; গিমে যাদুঘরে পূর্বদেশের বন্ধুসমিতির কর্তৃপক্ষের আহূত সভায় বাউল সম্বন্ধে বক্তৃতা। ২৫শে এপ্রিল M. Kahu'র সমিতির সম্মুখে কবির Public Spirit of India শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ; ব্রিটিশ রাজদূত Sir Thomas Barclay'র কবিকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ এবং এইখানে অধ্যাপক Geddes, Disjardin'র সহিত সাক্ষাৎ; ধনী কাচ্ছী ব্যবসায়ী শ্রীধর রাণা কর্তৃক তাঁর বিপুল লাইব্রেরী বিশ্বভারতীকে দান।

১৯২১—য়ুরোপ:—২৯শে এপ্রিল ষ্ট্রসবর্গে আগমন ও বিশ্ববিদ্যালয়ে The Message of the Forest প্রবন্ধ পাঠ; ৩০শে এপ্রিল জেনেভায় Rousau Instituteএ Education শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ; কবির এক ষষ্ঠদশ জন্মদিবস জার্মানীর সর্বত্র পালিত হয়; লুসার্ণ ও Basle পরিদর্শন; ১১ই মে জুরিক ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতা; Darmstadtএ কাউণ্ট কাইসারলিঙের সহিত অবস্থান; ২০শে মে হামবুর্গ ও ২৩শে মে কোপেন-হেগেন ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতা; সুইডেনে গমন ও বিপুল সংবর্ধনা লাভ; আপসালার সুপ্রাচীন ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতা; আপসালার আর্চবিশপের নেতৃত্বে সেখানকার ক্যাথিড্রালে বক্তৃতা দেবার জন্য কবিকে নিয়ে টর্চ শোভাযাত্রা; ষ্টকহলমের সুইডিশ এ্যাকেডেমির অনুষ্ঠিত ভোজ-সভায় কবির বক্তৃতা; সুইডেনের রাজার সহিত সাক্ষাৎ; বার্লিনে পুনরাগমন ও হুগোষ্টিনেসের সহিত অবস্থান; বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির দু'টি বক্তৃতা; কবিকে দেখবার জন্য অসম্ভব জনসমাগম; চিন্তাশীল

অর্থনীতিজ্ঞ ওয়াল্টার রাথেনাউ কর্তৃক কবিকে পানভোজনে আপ্যায়ন; মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা ও টমাসম্যানের সহিত সাক্ষাৎকার; ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা; Darmstadtএ Hesseর Grand Duke'র সঙ্গে অবস্থান; কাউণ্ট কাইসারলিং স্থাপিত "School of Wisdom"এ জনসাধারণের সহিত কবির ভাবাদান-প্রদান, জার্মান শ্রমিকদের এক বিরাট সভায় কবির বক্তৃতা এবং তাঁর উপলক্ষে অনুষ্ঠিত খোলা জায়গায় একটি উৎসবে যোগদান; ভিয়েনা, প্রাহা গমন এবং প্রত্যেক স্থানেই বিরাট জনমণ্ডলীর সম্মুখে বক্তৃতা; ১লা জুলাই প্যারিস ত্যাগ এবং ১৬ই জুলাই বোম্বেতে পদার্পণ।

১৯২২—**সিংহল**:—১১ই অক্টোবর সিংহল যাত্রা ও ডাঃ ডি' সিল্‌ভার আতিথ্য গ্রহণ; ১৩ই অক্টোবর **Y. M. C. A.** হলে প্রথম পাবলিক সভায় বক্তৃতা; ১৬ই কলম্বোর ভারতীয় ক্লাবে নানা জাতি ও সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মুখে বক্তৃতা; গালে গমন, বক্তৃতা ও মহিন্দ কলেজ পরিদর্শন; কলম্বোতে প্রত্যাবর্তন এবং নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে ত্রিবন্দরমে আগমন।

১৯২৪—চীন-জাপান:—২১শে মার্চ, ১৯২৪ চীনযাত্রার উদ্দেশ্যে কলিকাতা ত্যাগ; রেঙ্গুন, পেনাং, কুয়ালালামপুর ও সিঙ্গাপুর হয়ে ১২ই এপ্রিল সাংহাইএ উপস্থিতি; 'ভারতের সহিত চীনের সম্বন্ধ বহু যুগের'—কবির ভাষণ; ১৭ই এপ্রিল জাপানী জনসাধারণের সম্মুখে বক্তৃতা ও তা'দের উগ্র সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধার ও য়ুরোপের অন্ধ অনুকরণের নিন্দা; এ্যাংলো-আমেরিকান সংবাদপত্র কর্তৃক কবির উক্তির কঠোর সমালোচনা; ২৩শে এপ্রিল পেকিংএ উপস্থিতি; ২৬শে পেকিংয়ের ন্যাশানাল য়ুনিভার্সিটিতে কবির সংবর্ধনা; তরুণ চীনের চিন্তাজগতের নেতা ডাঃ হু-সির সহিত কবির পরিচয়; আরও কয়েকস্থানে বক্তৃতার পর কবির

২৯ মে, জাপানে গমন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে কবির প্রধানতঃ বক্তৃতা ; অগ্নিযুগের নির্বাসিত বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসুর সহিত সাক্ষাৎ ; ২১ জুলাই ভারতে প্রত্যাবর্তন।

১৯২৪—দক্ষিণ আমেরিকা—দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতার শতবার্ষিকী উৎসবে যোগদানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে কবির ১৯শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা ত্যাগ ; পথে অসুস্থতা ; বুইনস্ আয়ারসে পদার্পণ ও আর্জেনটিনিয়ায় কবিকে রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন ; পেরু গমন বন্ধ ; মাদাম ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর আতিথ্যগ্রহণ ও সান্ হাসদোবাতে তাঁর সুন্দর বাগান বাড়ীতে অবস্থান ; ৩০শে ডিসেম্বর আর্জেনটিনা রিপাবলিকের প্রেসিডেন্টের নিকট হ'তে বিদায় গ্রহণ।

১৯২৫—ইতালীঃ—৪ঠা জানুয়ারী ইতালীয় জাহাজে য়ুরোপ যাত্রা ; ২১শে জানুয়ারী জেনোয়াতে উপস্থিতি ; মিলানে ডিউক অফ মিলানের সভাপতিত্বে বক্তৃতা ও ডিউকের সঙ্গে সংগীত সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা ; বিখ্যাত ইতালীয় চিত্রকর Riette কর্তৃক তাঁর ছবি অংকন ; ২৯শে ভেনিস যাত্রা ; বিপুল সম্মানের সহিত এই ঐতিহাসিক নগরী পরিক্রমণ ; ১৭ই পুনরায় ভারতে প্রত্যাবর্তন।

১৯২৬—ইতালী—১২ই মে কলিকাতা ত্যাগ ; ৩০শে মে নেপল্‌সে উপস্থিতি এবং স্পেশাল ট্রেণে রোমে গমন ; ৩১শে মুসোলিনীর সহিত সাক্ষাৎ ; ৭ই জুন এই ঐতিহাসিক নগরীতে কবির সংবর্ধনা উৎসব ; ব্রিটিশ এ্যামবাসাডার কর্তৃক আর একটি সংবর্ধনা সভার আয়োজন ; The meaning of Art সম্বন্ধে কবির বক্তৃতা ; প্রাচীন Colloseumএ রোমের স্কুল-বালকবালিকাদের বাৎসরিক Choral concertএ যোগদান ; রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিনন্দন, ১১ই জুন ইতালীর রাজার সহিত সাক্ষাৎ ; ১৩ই জুন মুসোলিনীর সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাতের পর ইতালী

ভাষায় চিত্রার অভিনয় দর্শন ; বিখ্যাত দার্শনিক ক্রোচের সহিত সাক্ষাৎ ; ১৬ই জুন ফ্লোরেন্সের Leonardo da Vince সোসাইটি কর্তৃক কবি সংবর্ধনা ; পরের দিন ফ্লোরেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে My School সম্বন্ধে বক্তৃতা ; ২০শে জুন Turin সহরে City and Village সম্বন্ধে বক্তৃতা পাঠ ; প্রবন্ধ পাঠান্তে বিখ্যাত ইতালিয়ান গায়িকা Lepovetaka কবির তিনখানি সংগীত বাংলায় গান করেন। তুরিন থেকে কবির সুইজার-ল্যাণ্ড গমন।

সুইজারল্যাণ্ড—বহু অত্যাচারিত ইতালীয়ের সাক্ষাৎ এবং ইতালীয় কাগজে কবি কর্তৃক ডুচের প্রশংসার অতিরঞ্জিত বর্ণনা দর্শন ; ভিলেনভুতে উপস্থিতি ; রোমা রঁলা, George Duhamel, J. C. Frazer, প্রফেসর ফোরেল, অধ্যাপক কেভের সহিত সাক্ষাৎ ; ৬ই জুলাই জুরিকে ইতালির অধ্যাপক সলভাদোরির স্ত্রীর সহিত পরিচয় ; ম্যান্চেষ্টার গার্ডেনে কবির ফ্যাসিজিমের নিন্দাসূচক পত্র ; অধ্যাপক Formichir প্রতিবাদ ও কবির প্রত্যুত্তর ; একদিন লুসার্ণ সহরে অবস্থান।

অষ্ট্রীয়া—১০ই জুলাই ভিয়েনা গমন ; বিখ্যাত সমাজতন্ত্রী নেতা Dr. Angelica Balbanoff ও সিনিয়োর Modigliavi'র সহিত পরিচয়।

ইংলণ্ড—অগাষ্টের গোড়ার দিকে ইংলণ্ড গমন ; এপস্টাইন কর্তৃক কবির bust নির্মাণ ; Brailsford, রোদেনষ্টাইন, রবার্ট ব্রিজেস প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ।

নরওয়ে—২১শে অগাষ্ট নরওয়ে যাত্রা ; অসলোতে নরওয়ের রাজার সহিত সাক্ষাৎ ; Nansen, Bjornsen, Bojer'র সহিত সাক্ষাৎ।

সুইডেন ও ডেনমার্ক—ষ্টকহলমে (সুইডেন) Seven Hedin ও সুইডিশ একেডেমির সদস্যবৃন্দ কর্তৃক কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন ;

কোপেনহেগেনে গমন; সেখানে পাবলিক সভায় কবির আদর আপ্যায়ন; দার্শনিক হেফডিং ও সাহিত্যিক ব্রান্দেসের সহিত সাক্ষাৎ।

জার্মানী—১০ই সেপ্টেম্বর হামবুর্গে উপস্থিতি—বার্লিন গমন ও ১৩ই সেপ্টেম্বর Philhar monic Hallএ "ভারতীয় দর্শন" সম্বন্ধে বক্তৃতা—১৪ই প্রেসিডেণ্ট Von Hindenburg'র সহিত সাক্ষাৎ—কুরট্ উলফ কর্তৃক কবি সংবর্ধনা—ম্যান্‌চেষ্টার গার্ডেনে মুসোলিনীর প্রশংসা ও ফ্যাসিবাদের নিন্দাসূচক পত্র প্রেরণ—Popolo d'Italia'র কবির প্রতি আক্রমণ ও গালিগালাজ—কোলন ও ড্রেসডেনে বক্তৃতা—বার্লিনে প্রত্যাবর্তন ও চেকোশ্লোভাকিয়া যাত্রা।

চেকোশ্লোভাকিয়া—প্রাহায় "Art forms" ও "Civilisation and Progress" সম্বন্ধে বক্তৃতা; চেক কর্তৃক নিয়োজিত বিশেষ প্লেনে ভিয়েনায় গমন ও প্রচুর সম্মান প্রাপ্তি।

হাঙ্গারী—২৬শে বুদাপেস্তে বক্তৃতা—বিখ্যাত হাঙ্গারির কবি Sander Kisfalndy's মর্মর মুর্তির সম্মুখে বাংলার কবি কর্তৃক বৃক্ষ রোপণ ও ঔপন্যাসিক Maurice Jokai'র স্মৃতিস্তম্ভে মাল্যদান—Balaton স্বাস্থ্যনিবাসে অবস্থান।

যুগশ্লাভিয়া ও **বুলগেরিয়া**—বেলগ্রেড যুগশ্লাভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা; সফিয়াতে (বুলগেরিয়া) রাজা বোরিস কর্তৃক কবির সংবর্ধনা।

রুমানিয়া—বুখারেষ্টে (রুমানিয়া) রুমানিয়ার রাজা ফার্ডিনাণ্ডের সহিত সাক্ষাৎ ও মধ্যাহ্নভোজন।

গ্রীস—২৫শে নভেম্বর এথেন্সে উপস্থিতি; গ্রীসের রাজা কর্তৃক কবিকে Commander of the order of the Reedeemer উপাধি দান।

মিশর—গ্রীস থেকে তুরস্কের পথে ইজিপ্ট গমন; ২৭শে আলেক-

আলেকজান্দ্রিয়ায় উপস্থিতি: কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে পার্লামেন্টের অধিবেশন স্থগিত; মন্ত্রীপরিষদ কর্তৃক কবি সংবর্ধনা ও কবির আরবী গান শ্রবণ; King Fuad'র সহিত সাক্ষাৎ ও রাজা কর্তৃক বিশ্বভারতীর জন্য কবিকে আরবী গ্রন্থ উপহার; আলেকজান্দ্রিয়া হ'তে ডিসেম্বর মাসে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন।

১৯২৭—দ্বীপময় ভারত:—১২ই জুলাই মালয়. জাভা, বালি ও থাইল্যাণ্ডে যাত্রা। ২০শে জুলাই সিঙ্গাপুরে উপস্থিতি; লাট সাহেব Sir Hugh Cliford'র সভাপতিত্বে ভিক্টোরিয়া থিয়েটারে "Unity of man" সম্বন্ধে বক্তৃতা—বহু সামাজিক অনুষ্ঠানের পর ২৭শে মালাক্কা যাত্রা—কুয়ালালামপুর, সেরেম্বান, সেলাঙগর. ক্লাঙ, কুয়ালা কাঙসার, তাইমিং প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা দিতে দিতে কবির পেনাংএ উপস্থিতি—সুমাত্রা যাত্রা। ২২শে অগাষ্ট বাটাভিয়ায় আগমন—ব্রিটিশ কনসাল ক্রসবি সাহেব কর্তৃক ডচ্ গভর্ণর জেনারেলের সঙ্গে কবির পরিচয় করণ—সন্ধ্যায় কন্‌সাল গৃহে ভোজানুষ্ঠানে কবির 'শ্রীবিজয়লক্ষ্মী কবিতা'র ইংরেজী অনুবাদ পাঠ—২৩শে বালি দ্বীপ যাত্রা—২৪শে অগাষ্ট বালিতে আগমন ও রাজোচিত সম্মানে সমগ্র দ্বীপ পরিদর্শন—বালির নৃত্যকলা দর্শনে পরম সন্তোষ—বালি থেকে ৯ই সেপ্টেম্বর সুরাবায়ায় উপস্থিতি—১২ই পুবকর্তায় আগমন—কবির নামে একটি সাঁকো ও রাস্তা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্তকরণ—বিখ্যাত বারবাদুরের মন্দিরে গমন—বান্দুঙ ও বাটাভিয়ার পথে থাইল্যাণ্ডে আগমন—রাজা রাণী ও বিখ্যাত পালী স্কলার Prince of Chantabeen কর্তৃক সংবর্ধনা—২৭শে অক্টোবর দেশে প্রত্যাগমন।

১৯২৮—সিংহল—৩১শে মে কবির কলম্বো গমন ও Dr. W. De Silva'র আতিথ্য গ্রহণ; ১০ই জুন সিংহল ত্যাগ।

১৯২৯—জাপান ও কানাডা—কানাডার National Council of Educationর আহ্বানে ও বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে ২৬শে ফেব্রুয়ারী কবির কলিকাতা ত্যাগ—২৬শে মার্চ টোকিয়োতে উপস্থিতি ও বিখ্যাত জাপানী সংবাদপত্র Asahi Shimbunএর অতিথি হিসেবে দুদিন অবস্থান; ৬ই এপ্রিল ভ্যাঙ্কুভারে উপস্থিতি—কনফারেন্সে প্রথম দিনে তাঁর বিখ্যাত "The philosophy of Leisure" সম্বন্ধে বক্তৃতা দান – পরের দিন "Principles of literature" সম্বন্ধে বক্তৃতা – ১২ই এপ্রিল ভাঙ্কুভারের শিথমন্দির পরিদর্শন—১৪ই কানাডায় বিদায় বক্তৃতা – Harvard, কলম্বিয়া, কালিফোর্নিয়া, ডেট্রয়েট বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে সেখানে যাওয়ার পথে ১৮ই এপ্রিল Los Angelesএ উপস্থিতি – পাসপোর্ট হারান—পাসপোর্ট অফিসে কবির প্রতি অসম্মানসূচক ব্যবহারে অপমানিত হয়ে কবির আমেরিকা গমন পরিত্যাগ—২০শে এপ্রিল জাপান যাত্রা—পথে হনলুলুতে অবতরণ—জাহাজে কাপ্তেন ও প্যাসেঞ্জার কর্তৃক কবির জন্মদিনোৎসব পালন – টোকিয়োতে "Oriental culture and Japan's mission" সম্বন্ধে বক্তৃতা—Marquis Skuma কর্তৃক কবির সংবর্ধনা—৮ই জুন ভারত যাত্রা—পথে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক কবিকে অভ্যর্থনা—৫ই জুলাই, ১৯২৯ কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন।

১৯৩০-৩১—য়ুরোপ—২রা মার্চ বিদেশ যাত্রা উপলক্ষে কলিকাতা ত্যাগ; ২৬শে মার্সেলিসে উপস্থিতি—M. Kahu'র অতিথি হিসেবে Monti Carloর নিকট Cap Martinএ অবস্থান—চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রেসিডেণ্ট ম্যাসারিকির সহিত সাক্ষাৎ—২রা মে প্যারিসে নিজের অংকিত ১২০খানি ছবির একটি প্রদর্শনী—প্যারিসে তাঁর ৬৯তম জন্মদিন উৎসব পালিত হয়—১১ই মে লণ্ডন, সেখান থেকে ডার্টিং গমন

—ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলন, গান্ধিজীর গ্রেপ্তার—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন—ঢাকায় হিন্দুমুসলমান দাঙ্গা—পুলিশের অত্যাচার কাহিনী শ্রবণ —Manchester Guardian পত্রিকার সংবাদ প্রতিনিধিদের নিকট কবির বক্তব্য প্রকাশ।

ইংলণ্ড—১৭ই অক্সফোর্ড গমন—ম্যান্‌চেষ্টার কলেজে ১৯শে মে প্রথম Hibbert Lecture দান—লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন ও Secretary of State for India, Wedgewood Benn'র সঙ্গে ভারতের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা—কোয়েকারদের বাৎসরিক অধিবেশনে কবির বক্তৃতা ও ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনা—পুনরায় ম্যান্‌চেষ্টারে প্রত্যাবর্তন—Manchester Collegeএ ২৬শে বক্তৃতা দান—University College এর Principal Sir Michael Sadler'র প্রতিভাষণ—২রা জুন নিজের চিত্র প্রদর্শনী পরিদর্শন—৭ই জুন স্পেক্‌টেটারে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার আলোচনা করে পত্র প্রেরণ—ডিভনশিয়ারে Totnes নামক স্থানে এলমহার্ষ্ট স্থাপিত বিদ্যালয় পরিদর্শন।

জার্মানী—জার্মানী যাত্রা—১১ই জুলাই বার্লিনে উপস্থিতি—১২ই রাইখ্‌ষ্ট্যাগের প্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাৎকার—১৪ই আইনষ্টাইনের সহিত সাক্ষাৎ—Gallery Mollerএ নিজ অংকিত চিত্র প্রদর্শনী উদ্বোধনের পর ১৬ই জুলাই ড্রেসডেন যাত্রা—সেখান থেকে মিউনিক—মিউনিক টাউনহলে কবির নাগরিক সংবর্ধনা—Oberammergau'র বিখ্যাত Passion play অভিনয় দর্শন।

ডেনমার্ক—রাজকীয় সম্মানের সহিত দ্রুত বহু নগরী পর্যটনের পর কবির ডেনমার্ক গমন।

অষ্ট্রীয়া—৯ই অগাষ্ট কপেনহেগেনে নিজের অংকিত ছবির প্রদর্শনী উদ্বোধন—জেনেভায় গমন—ঢাকার দাঙ্গার কথা শ্রবণ ও ব্রিটিশ সংবাদ-



রবীন্দ্রনাথ ও আইনষ্টাইন

পত্রে সে সম্বন্ধে নীরবতা লক্ষ্য করে স্পেকটেটারে কবির প্রতিবাদ (৩০শে অগাষ্ট)। রাশিয়ার উদ্দেশ্যে জেনেভা ত্যাগ।

রাশিয়া—১১ই সেপ্টেম্বর মস্কোতে উপস্থিতি—White Russian Baltic Station Voks অর্থাৎ Society for Cultural Relations with Foreign Countries'র প্রতিনিধি কর্তৃক কবি সংবর্ধনা—পরদিন সমিতির সভাপতি Prof. F. N. Petroffর সভাপতিত্বে Voks বিল্‌ডিংএ কবি সংবর্ধনা-সেইদিন বিকেলে Voks ও মস্ক সাহিত্যিক সমিতি কর্তৃক তাঁদের ক্লাবে কবিকে আপ্যায়ন—Prof. Kogan, Prof. Pinkivitch, মাদাম Letrenov, মাদাম Ognyd, মাদাম Vera inber, Fedor Gladkov, Essev ও অন্যান্য সোভিয়েট সাহিত্যিক ও আর্টিষ্টদের সঙ্গে কবির পরিচয়—১৪ই পায়োনীয়র কমিয়ুনে ও ১৬ই Peasants Homeএ গমন—১৭ই সেপ্টেম্বর State Moscow Museum of New Western Artএ কবির চিত্রপ্রদর্শনী—প্রচুর প্রশংসা লাভ—মস্কো আর্ট থিয়েটারে গমন ও Peter the Great, Resurrection ও Biaderkaর অভিনয় দর্শন—ছাত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও ভারতে নিজের বিদ্যালয়ের সংবাদ জ্ঞাপন—Industrial Labourer's Commune, Central Ethnographical State Museum, Children creche, Kindergarten of the Moscow Dynamo Works,the Museum of Handicrafts, the Museum of Revolution ও অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন—২৪শে সেপ্টেম্বর Central House of Trade Unionsএ অনুষ্ঠিত অভ্যর্থনা সভায় বিদায় বক্তৃতা—সোভিয়েট কবির "Ode to Rabindranath" নামক কবিতা পাঠ ও লেখক Galperin'র রাশিয়ান ভাষায় কবির তিনটি কবিতা আবৃত্তি ও অভিনেতা Simonovএর Post Office হতে

কয়েকটি দৃশ্য অভিনয়। ২৫শে রাশিয়া ত্যাগ—জার্মানী যাত্রা ও সেখান থেকে ৩রা অক্টোবর আমেরিকার পথে।

আমেরিকা—২৫শে নভেম্বর Beltmore Hotelএ (New York) চারশ' গণ্যমান্য অতিথিদের অভিনন্দন সভায় যোগদান; প্রেসিডেণ্ট হুভারের সহিত সাক্ষাৎ; ১লা ডিসেম্বর কারনেগী হলে (New York) বক্তৃতা; ৭ই ডিসেম্বর Bakanএ "The first and last Prophet of Persia" সম্বন্ধে ভাষণ; প্রখ্যাত নর্তকী Ruth St. Des'র রবীন্দ্রনাথের কবিতা নৃত্যাভিনয় দ্বারা অর্থসংগ্রহের প্রস্তাব ও কবির অনুমোদন—সংগৃহীত অর্থ নিউইয়র্কের বেকারদের সাহায্যে ব্যয়—বোষ্টন ও নিউইয়র্কে নিজ চিত্রের প্রদর্শনী—The Case for Indiaর লেখক Will Durant'র সহিত সাক্ষাৎ।

ইংল্যাণ্ড—২২শে ডিসেম্বর ইংলণ্ডে প্রত্যাবতন—Round Table Conferenceএ Mediator হবার আমন্ত্রণ গ্রহণে অস্বীকার—৮ই জানুয়ারী ১৯৩১ Hyde Parkএ Spectator'র সম্পাদক কর্তৃক মধ্যাহ্ন-ভোজনে আপ্যায়ন—বার্নার্ড শ'র সহিত দীর্ঘ আলোচনা—ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতে প্রত্যাবর্তন।

১৯৩২—ইরান-ইরাক:—১১ই এপ্রিল বিমানে পারস্য যাত্রা—পারস্য সীমানা অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে পারস্য সরকারের বেতারে অভিনন্দন—১৩ই এপ্রিল বুশায়াতে গভর্ণর কর্তৃক সংবর্ধনা এবং জনসাধারণ কর্তৃক কবিকে সম্মান জ্ঞাপন—১৬ই শিরাজে রাজোচিত অভিনন্দন—হাফিজের সমাধিতে কবির শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন—Persopoles হয়ে ২২শে ইস্পাহানে আগমন—সেখানে নাগরিক সংবর্ধনার পর তেহারানে উপস্থিতি—প্রচুর সম্মান লাভ—২রা মে His Majesty Reja Shah Pehlavi'র সহিত সাক্ষাৎ—কবি কর্তৃক রেজাকে একটি

কবিতা উপহার; সাহের আদেশে কবির ৭২তম জন্মদিনোৎসব প্রচুর জাঁক-জমকের সহিত অনুষ্ঠিত হয়—ইরাক হ'তে আমন্ত্রণ—ভারতে প্রত্যাবর্তনের পথে বাগদাদে রাজা ফৈজলের সহিত সাক্ষাৎ, নাগরিক সংবর্ধনা, বেদুইনদের শিবিরে গমন—৩রা জুন বিমানপথে প্রত্যাবর্তন।

১৯৩৪—সিংহল :- ৬ই মে সিংহল যাত্রা—৯ই কলম্বোতে আগমন—Rotary Clubএ সংবর্ধনা ও বিশ্বভারতীর কথা রেডিওতে প্রচার—Indian Mercantile Chamber of Commerce কর্তৃক কবিকে অভিনন্দন পত্র প্রদান—১৫ই কলম্বো করপোরেশনে নাগরিক সংবর্ধনা—শাপমোচন অভিনয়—তাঁর চিত্রপ্রদর্শনী—১৭ই কবিতা আবৃত্তি—১৯শে Pandura গমন এবং একটি বিদ্যালয়ের নামকরণ—Kandy আগমন—উত্তর সিংহল গমন এবং মাদ্রাজের পথে ২৪শে জুন শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন।

বাংলা রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী

১৮৭৮

১। কবিকাহিনী (কাব্য)।

১৮৮০

২। বনফুল (কাব্যোপন্যাস)

১৮৮১

৩। বাল্মীকি-প্রতিভা (গীতিনাট্য); ৪। ভগ্নহৃদয় (গীতিকাব্য); ৫। রুদ্রচণ্ড (নাটিকা); ৬। য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র।

১৮৮২

৭। সন্ধ্যা সঙ্গীত (কবিতা); ৮। কালমৃগয়া (গীতিনাট্য)।

১৮৮৩

৯। বৌঠাকুরাণীর হাট (উপন্যাস); ১০। প্রভাত সঙ্গীত (কবিতা); ১১। বিবিধ প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ)।

১৮৮৪

১২। ছবি ও গান (কবিতা); ১৩। প্রকৃতির প্রতিশোধ (নাট্য-কাব্য); ১৪। নলিনী (নাট্য); ১৫। শৈশব সঙ্গীত (কবিতা); ১৬। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী।

১৮৮৫

১৭। রামমোহন রায় (প্রবন্ধ); ১৮। আলোচনা (প্রবন্ধ); ১৯। রবিচ্ছায়া (গান)।

১৮৮৬

২০। কড়ি ও কোমল (কবিতা)।

বাংলা রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী

১৮৮৭

২১। রাজর্ষি (উপন্যাস); ২২। চিঠিপত্র।

১৮৮৮

২৩। সমালোচনা (প্রবন্ধ); ২৪। মায়ার খেলা (গীতিনাট্য)।

১৮৮৯

২৫। রাজা ও রাণী (নাটক)।

১৮৯০

২৬। বিসর্জন (নাটক); ·৭। মন্ত্রি অভিষেক (প্রবন্ধ); ২৮। মানসী (কবিতা)।

১৮৯১

২৯। য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি (ভূমিকা) ১ম খণ্ড।

১৮৯২

৩০। চিত্রাঙ্গদা (কাব্য); ৩১। গোড়ায় গলদ (প্রহসন)।

১৮৯৩

৩২। গানের বহি ও বাল্মীকি প্রতিভা; ৩৩। য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি, ২য় খণ্ড।

১৮৯৪

৩৪। সোনার তরী (কবিতা); ৩৫। ছোট গল্প; ৩৬। চিত্রাঙ্গদা ও বিদায় অভিশাপ (চিত্রাঙ্গদা পূর্বেই একবার প্রকাশিত); ৩৭। বিচিত্র গল্প, ১ম ও ২য় ভাগ; ৩৮। কথা-চতুষ্টয়।

১৮৯৫

৩৯। ছেলে ভুলানো ছড়া; ৪০। গল্প-দশক।

১৮৯৬

৪১। নদী (কবিতা); ৪২। চিত্রা (কবিতা); ৪৩। সংস্কৃত

শিক্ষা, ১ম ও ২য় ভাগ ; ৪৪। কাব্যগ্রন্থাবলী (এই কাব্য সংগ্রহে 'মালিনী' (নাটক) ও 'চৈতালী' (কবিতা) সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।)

১৮৯৭

৪৫। বৈকুণ্ঠের খাতা (প্রহসন) ; ৪৬। পঞ্চভূত (প্রবন্ধ)।

১৮৯৯

৪৭। কণিকা (কবিতা)।

১৯০০

৪৮। কথা (কবিতা) ; ৪৯। ব্রহ্মোপনিষদ (ধর্মমূলক প্রবন্ধ) ; ৫০। কাহিনী (নাট্যকাব্য ও কবিতা) ; ৫১। কল্পনা (কবিতা) ; ৫২। ক্ষণিকা (কবিতা) ; ৫৩। গল্পগুচ্ছ, ১ম খণ্ড।

১৯০১

৫৪। ব্রহ্মমন্ত্র (ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ) ; ৫৫। গল্প (গল্পগুচ্ছের ২য় খণ্ড) ; ৫৬। নৈবেদ্য (কবিতা) ; ৫৭। উপনিষদ ব্রহ্ম (ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ) ; ৫৮। বাঙ্‌লা ক্রিয়া-পদের তালিকা।

১৯০৩

৫৯। চোখের বালি (উপন্যাস) ; ৬০। কাব্য-গ্রন্থ, ১—৯ ভাগ (এই সংগ্রহে 'স্মরণ' (কবিতা) ও শিশু (কবিতা) নামক কবিতা পুস্তক দু'টি স্থান পেয়েছে।) ৬১। কর্ম্মফল (গল্প)।

১৯০৪

৬২। ইংরাজি সোপান, ১ম খণ্ড (পাঠ্য পুস্তক) ; ৬৩। স্বদেশী সমাজ (প্রবন্ধ) ; ৬৪। রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী (এই সংগ্রহে 'নষ্টনীড় ও 'চিরকুমার সভা' প্রকাশিত হয়েছে।)

বাংলা রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী

১৯০৫

৬৫। আত্মশক্তি (প্রবন্ধ); ৬৬। বাউল (গান); ৬৭। স্বদেশ (কবিতা); ৬৮। বিজয়া সম্মিলন (বক্তৃতা)।

১৯০৬

৬৯। ভারতবর্ষ (প্রবন্ধ); ৭০। রাজভক্তি (রাজনৈতিক প্রবন্ধ); ৭১। দেশ নায়ক (রাজনৈতিক প্রবন্ধ); ৭২। ইংরাজি সোপান, ২য় ভাগ (পাঠ্যপুস্তক); ৭৩। খেয়া (কবিতা); ৭৪। নৌকাডুবি (উপন্যাস)।

১৯০৭

৭৫। বিচিত্র প্রবন্ধ; ৭৬। চারিত্রপূজা (প্রবন্ধ); ৭৭। প্রাচীন সাহিত্য (প্রবন্ধ); ৭৮। লোক সাহিত্য (প্রবন্ধ); ৭৯। সাহিত্য (প্রবন্ধ); ৮০। আধুনিক সাহিত্য (প্রবন্ধ); ৮১। হাস্য-কৌতুক; ৮২। ব্যঙ্গ কৌতুক।

১৯০৮

৮৩। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ (উপন্যাস)। ১৯০৪ খৃঃ অব্দে হিতবাদী অফিস কর্ত্তৃক 'রবীন্দ্র গ্রন্থাবলীতে' 'চিরকুমার সভা' নামে প্রকাশিত।); ৮৪। সভাপতির অভিভাষণ—পাবনা সম্মিলনী; ৮৫। প্রহসন (পূর্ব-প্রকাশিত 'বৈকুণ্ঠের খাতা' ও 'গোড়ায় গলদ' একত্রিত করে মুদ্রিত); ৮৬। পথ ও পাথেয় (প্রবন্ধ); ৮৭। রাজাপ্রজা (রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ); ৮৮। সমূহ (রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ); ৮৯। স্বদেশ (প্রবন্ধ); ৯০। সমাজ (প্রবন্ধ); ৯১। কথা ও কাহিনী (মোহিত চন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্য গ্রন্থের 'কথা ও কাহিনী'র পুনর্মুদ্রন); ৯২। গান; ৯৩। শারদোৎসব (নাটক); ৯৪। শিক্ষা (প্রবন্ধ); ৯৫। মুকুট (নাটিকা)।

১৯০৯

৯৬। ব্রহ্মসঙ্গীত; ৯৭। শান্তিনিকেতন (প্রবন্ধ) ১—৮ ভাগ; ৯৮। ধর্ম্ম (প্রবন্ধ); ৯৯। শব্দতত্ত্ব; ১০০। চয়নিকা (কবিতা সংগ্রহ); ১০১। গান; ১০২। ইংরাজি পাঠ (পাঠ্যপুস্তক); ১০৩। ছুটির পড়া; ১০৪। প্রায়শ্চিত্ত (নাটক); ১০৫। বিদ্যাসাগর চরিত (বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত দুইটি প্রবন্ধ পূর্বে 'চারিত্রপূজায়' প্রকাশিত হয়েছে); ১০৬। শিশু, (মোহিত সেন সম্পাদিত কাব্য গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট 'শিশু' কবিতা পুস্তকের পুনর্মুদ্রন); ১০৭। ইংরাজি শ্রুতি শিক্ষা (প্রকৃতপক্ষে 'ইংরাজি সোপান' ১ম খণ্ডের উপক্রমণিকা অংশ)।

১৯১০

১০৮। ব্রহ্মসঙ্গীত; ১০৯। শান্তিনিকেতন (প্রবন্ধ) ৯—১১ ভাগ; ১১০। গোরা, ১ম ও ২য় খণ্ড (উপন্যাস); ১১১। গীতাঞ্জলি (কবিতা ও গান); ১১২। রাজা (নাটক)।

১৯১১

১১৩। শান্তিনিকেতন (প্রবন্ধ) ১২-১৩ ভাগ; ১১৪। আটটি গল্প।

১৯১২

১১৫। ডাকঘর (নাটক); ১১৬। ধর্ম্মশিক্ষা (প্রবন্ধ); ১১৭। ধর্ম্মের অধিকার (প্রবন্ধ); ১১৮। গল্প চারিটি; ১১৯। মালিনী (নাটক); ১২০। চৈতালি (কবিতা), ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কাব্যগ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত; ১২১। বিদায়-অভিশাপ (নাট্য কাব্য), ইতিপূর্বেই ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে 'চিত্রাঙ্গদা'র সহিত প্রকাশিত; ১২২। পাঠ-সঞ্চয় (পাঠ্য পুস্তক); ১২৩। জীবন-স্মৃতি (আত্মজীবনী); ১২৪। ছিন্নপত্র; ১২৫। অচলায়তন (নাটক)।

বাংলা রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী

১৯১৪

১২৬। স্মরণ (কবিতা), ইতিপূর্ব্বেই মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্য গ্রন্থে প্রকাশিত ; ১২৭। উৎসর্গ (কবিতা), মোহিত চন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্য গ্রন্থ হ'তে বেশীর ভাগ কবিতাগুলি সংগৃহীত) ; ১২৮। গীতিমাল্য (কবিতা ও গান) ; ১২৯। গান ; ১৩০। গীতালি (কবিতা ও গান) ; ১৩১। ধর্ম্মসঙ্গীত।

১৯১৫

১৩২। শান্তি-নিকেতন ১৪শ ভাগ ; ১৩৩। বিচিত্র পাঠ ; ১৩৪। কাব্যগ্রন্থ।

১৯১৬

১৩৫। শান্তিনিকেতন (প্রবন্ধ) ১৫-১৭শ ভাগ ; ১৩৬। ফাল্গুনী (নাটক) ; ১৩৭। ঘরে-বাইরে (উপন্যাস) ; ১৩৮। সঞ্চয় (প্রবন্ধ) ; ১৩৯। পরিচয় (প্রবন্ধ) ; ১৪০। বলাকা (কবিতা) ; ১৪১। চতুরঙ্গ (উপন্যাস) ; ১৪২। গল্পসপ্তক।

১৯১৭

১৪৩। কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম (প্রবন্ধ) ; ১৪৪। অনুবাদ-চর্চ্চা (পাঠ্যপুস্তক)।

১৯১৮

১৪৫। গুরু (নাটক) ; ১৪৬। পলাতকা (কবিতা)।

১৯১৯

১৪৭। জাপান-যাত্রী।

১৯২০

১৪৮। অরূপরতন (নাটক) ; ১৫০। পয়লা নম্বর (গল্প)।

বাহির বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ

১৯২১

১৫১। শিক্ষার মিলন (প্রবন্ধ); ১৫২। বর্ষামঙ্গল; ১৫৩। ঋণশোধ (নাটক); ১৫৪। সত্যের আহ্বান (বক্তৃতা)।

১৯২২

১৫৫। মুক্তধারা (নাটক); ১৫৬। লিপিকা (কথিকা); ১৫৭। শিশু-ভোলানাথ (কবিতা)।

১৯২৩

১৫৮। বসন্ত (গীতিনাট্য)।

১৯২৫

১৫৯। পূরবী (কবিতা); ১৬০। শেষবর্ষণ (গীতিনাট্য); ১৬১। গৃহপ্রবেশ (নাটক); ১৬২। সঙ্কলন (গদ্য সংগ্রহ); ১৬৩। প্রবাহিনী (গান); ১৬৪। গীতি-চর্চ্চা (গান)।

১৯২৬

১৬৫। আচার্যের অভিভাষণ; ১৬৬। চিরকুমার সভা (নাটক); ১৬৭। শোধবোধ (নাটক); ১৬৮। নটীর পূজা (নাটক); ১৬৯। ঋতু-উৎসব (নাট্য-সংগ্রহ); ১৭০। রক্তকরবী (নাটক)।

১৯২৭

১৭১। লেখন (কবিতা কণা); ১৭২। ঋতু-রঙ্গ (গীতি নাট্য)।

১৯২৮

১৭৩। পালিপ্রকৃতি (শ্রীনিকেতনের বাৎসরিক উৎসবের অভিভাষণ); ১৭৪। শেষরক্ষা (প্রহসন)।

১৯২৯

১৭৫। সমবায়ন্তী (কো-অপারেটিভ কনফারেন্সের অভিভাষণ); ১৭৬। যাত্রী; ১৭৭। পরিত্রাণ (নাটক); ১৭৮। যোগাযোগ (উপন্যাস);

১৭৯। শেষের কবিতা (উপন্যাস); ১৮০। তপতী (নাটক); ১৮১। মহুয়া (কবিতা)।

১৯৩০

১৮২। ইংরেজি সহজ শিক্ষা, ১ম ও ২য় ভাগ (পাঠ্যপুস্তক); ১৮৩। সহজ পাঠ, ১ম—২য় ভাগ, (পাঠ্যপুস্তক); ১৮৪। পাঠপরিচয়, ২য়—৪র্থ ভাগ (পাঠ্যপুস্তক); ১৮৫। ভানুসিংহের পত্রাবলী।

১৯৩১

১৮৬। নবীন (গীতিনাট্য); ১৮৭। রাশিয়ার চিঠি; ১৮৮। গীতোৎসব (গান); ১৮৯। বনবাণী (কবিতা); ১৯০। গীতবিজ্ঞান—১ম ও ২য় খণ্ড (গান সংগ্রহ); ১৯১। সঞ্চয়িতা (কবিতা সংগ্রহ); ১৯২। প্রতিভাষণ (রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসবে ছাত্রদের সম্মুখে পঠিত কবির অভিভাষণ); ১৯২। শাপ-মোচন (কথিকা ও গান)।

১৯৩২

১৯৩। দেশের কাজ (বক্তৃতা); ১৯৪। গীত-বিতান, ৩য় খণ্ড (গান সংগ্রহ); ১৯৫। কালের যাত্রা (নাট্য); ১৯৬। চৌঠা আশ্বিন (বক্তৃতা); ১৯৭। মহাত্মাজীর শেষ ব্রত (বক্তৃতা); ১৯৮। পরিশেষ (কবিতা); ১৯৯। পুনশ্চ (গদ্য কাব্য); ২০০। Mahatmaji and the Depressed Humanity (ভাষণ—একখানি ইংরাজি-বাংলা পুস্তিকা)।

১৯৩৩

২০১। বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা); ২০২। দুই বোন (উপন্যাস); ২০৩। শিক্ষার বিকিরণ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা); ২০৪। মানুষের ধর্ম্ম (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 'কমলা লেকচার্স'); ২০৫। বিচিত্রিতা (কবিতা); ২০৬। চণ্ডালিকা (নাটিকা); ২০৭। তাসের দেশ

(নাটিকা); ২০৮। বাঁশরী (নাটক); ২০৯। ভারত পথিক রাম-মোহন রায় (বক্তৃতা)।

১৯৩৪

২১০। মালঞ্চ (উপন্যাস); ২১১। শ্রাবণ-গাথা (গীতিনাট্য), ২১২। শ্রীভবন সম্বন্ধে অমর আদর্শ (প্রবন্ধ); ২১৩। চার অধ্যায় (উপন্যাস)।

১৯৩৫

২১৪। শান্তিনিকেতন—১ম ও ২য় খণ্ড; ২১৫। শেষ সপ্তক (গদ্য কাব্য); ২১৬। সুর ও সঙ্গতি (শ্রীধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহিত পত্রালাপ); ২১৭। বীথিকা (কবিতা)।

১৯৩৬

২১৮। শিক্ষার সঙ্গীকরণ (বক্তৃতা); ২১৯। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা; ২২০। পত্রপুট (কবিতা); ২২১। ছন্দ (প্রবন্ধ); ২২২। জাপানে-পারস্যে (ডায়েরি); ২২৩। শ্যামলী (গদ্য কাব্য); ২২৪। শিক্ষার ধারা (প্রবন্ধ); ২২৫। সাহিত্যের পথে; (প্রবন্ধ); ২২৬। পাশ্চাত্য ভ্রমণ; ২২৭। প্রাক্তনী (অভিভাষণ)।

১৯৩৭

২২৮। খাপছাড়া (ছড়া); ২২৯। কালান্তর (প্রবন্ধ); ২৩০। সে (গল্প); ২৩১। ছড়ার ছবি (কবিতা); ২৩২। বিশ্বপরিচয় (বিজ্ঞান পুস্তক)।

১৯৩৮

২৩৩। প্রান্তিক (কবিতা); ২৩৪। চণ্ডালিকা নৃত্য নাট্য; ২৩৫। পথে ও পথের প্রান্তে (পত্রাবলী); ২৩৬। সেঁজুতি (কবিতা); ২৩৭। পত্রধারা ১—৩য় খণ্ড; ২৩৮। অভিভাষণ (শ্রীনিকেতন ও শিল্প-ভাণ্ডার উদ্বোধনী বক্তৃতা); ২৩৯। বাংলা ভাষা পরিচয় (আলোচনা)।

১৯৩৯

২৪০। প্রহসনী (কবিতা); ২৪১। নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা; ২৪২। আকাশপ্রদীপ (কবিতা); ২৪৩। শ্যামা (নৃত্যনাট্য); ২৪৪। পথের সঞ্চয় (চিঠি); ২৪৫। মহাজাতি সদন (মহাজাতি সদনের ভিত্তি স্থাপন কালে প্রদত্ত বক্তৃতা); ২৪৬। রবীন্দ্রনাথের বাণী (মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর বাণী মন্দিরে কবির অভিভাষণ); ২৪৭। প্রসাদ; ২৪৮। অন্তর্দেবতা (শান্তিনিকেতন বাৎসরিক উৎসবে অভিভাষণ)।

১৯৪০

২৪৯। নবজাতক (কবিতা); ২৫০। সানাই (কবিতা); ২৫১। চিত্রলিপি; ২৫২। ছেলেবেলা; ২৫৩। তিন সঙ্গী (গল্প); ২৫৪। রোগশয্যায় (কবিতা); ২৫৫। আরোগ্য (প্রবন্ধ); ২৫৬। আদর্শ প্রশ্ন।

১৯৪১

২৫৭। আরোগ্য (কবিতা); ২৫৮। জন্মদিনে (কবিতা); ২৫৯। সভ্যতার সংকট (অভিভাষণ); ২৬০। গল্প-সল্প (গল্প ও কবিতা); ২৬১। আশ্রমের রূপ ও বিকাশ (প্রবন্ধ)।

২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ (১৯৪১) কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত।

২৬২। ছড়া; ২৬৩। শেষলেখা।

১৯৪২

২৬৪। চিঠিপত্র—১ম ও ২য় খণ্ড। ২৬৫। চিঠিপত্র ৩য় খণ্ড।

১৯৪৩

২৬৬। আত্মপরিচয় (প্রবন্ধ); ২৬৭। সাহিত্যের স্বরূপ (প্রবন্ধ)।

১৯৪৫

২৬৮। স্ফুলিঙ্গ।

[এই পুস্তক পঞ্জিকায় রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীর উল্লেখ করা হয় নি'। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত লেখা গ্রন্থাবলী আকারে বিশ্বভারতী হতে প্রকাশিত হবে। প্রথম খণ্ড আশ্বিন ১৩৪৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে। তারপর এ পর্যন্ত ১৯টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।]

রবীন্দ্র সম্পাদিত গ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছিলেন। নিম্নে তার একটি তালিকা দেওয়া হোল।

১। পদরত্নাবলী—বৈশাখ, ১২৯২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশ চন্দ্র মজুমদার কর্তৃক মহাজন পদাবলীর উৎকৃষ্ট কবিতা সংগ্রহ।

২। সংস্কৃত প্রবেশ—শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত।

১ম ভাগ—১৩ই জুলাই, ১৯০৪

২য় ভাগ—১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৫

৩য় ভাগ—৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৬

৩। শিক্ষক—১ম ভাগ—১৫ই জুলাই, ১৯০৪

৪। সংক্ষিপ্তম্ বাল্মীকীয় রামায়ণম্—রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্যকৃত। ইং ১৯১৫।

৫। কুরু পাণ্ডব। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮।

৬। বাংলা কাব্য পরিচয়।—১৩৪৫ সাল।

রবীন্দ্র সম্পাদিত সাময়িক পত্র

রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় কয়েকখানি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছে। যে গুলিতে সম্পাদক হিসেবে তাঁর নাম আছে তার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হোল।

১। সাধনা ৪র্থ বর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩০১—কার্ত্তিক ১৩০২।

২। ভারতী ২২শ বর্ষ, ১৩০৫।

৩। ভাণ্ডার ১ম বর্ষ, বৈশাখ, চৈত্র ১৩১২

২য় বর্ষ, বৈশাখ, চৈত্র ১৩১৩

৩য় বর্ষ, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় (যুগ্ম-সংখ্যা) ১৩১৪

৪। বঙ্গদর্শন নবপর্য্যায় ১ম—৫ম বর্ষ, ১৩০৮—১৩১২ সাল।

৫। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮শ কল্প, ১৮৩৩—১৮৩৬ শক (১৩১৮–২১ সাল)।

রবীন্দ্র ইংরেজী গ্রন্থ

১৯১২

১। Gitangali (গীতাঞ্জলি)—কবি কর্ত্তৃক অনূদিত; ১০৩টি কবিতার সমষ্টি; গীতাঞ্জলি হ'তে ৫১টি; গীতিমাল্য হ'তে ১৭টি; নৈবেদ্য হ'তে ১৬টি; খেয়া হ'তে ১১টি; শিশু হ'তে ৩টি; চৈতালি, স্মরণ, কল্পনা, উৎসর্গ ও অচলায়তনের প্রত্যেকটি হ'তে ১টি করে কবিতা নিয়ে ইংরেজী গীতাঞ্জলি।

১৯১৩

২। The Gardener : (কবিতা); কবি কর্তৃক অনূদিত। কোন বিশেষ বাংলা পুস্তকের অনুবাদ নয়। এতে ক্ষণিকা হ'তে ২৫টি, কল্পনা হ'তে ১৬টি, সোনার তরী হ'তে ৯টি; চৈতালি হ'তে ১৬টি, উৎসর্গ হ'তে ৬টি, চিত্রা হ'তে ৫টি, মানসী হ'তে ৩টি, মায়ার খেলা হ'তে ৩টি, খেয়া হ'তে ২টি এবং কড়ি ও কোমল, গীতালি ও শারদোৎসবের প্রত্যেকটি হ'তে ৩টি করে কবিতার সংকলন করা হয়েছে।

৩। The Crescent moon : (কবিতা); কবি স্বয়ং এর অনুবাদ করেছেন। বেশীর ভাগ কবিতা শিশু থেকে গৃহীত, তাছাড়া কড়ি ও কোমলের ৪টি, সোনার তরীর ১টি ও গীতমাল্যের ৩টি কবিতা আছে।

৪। Chitra (নাট্য)—চিত্রাঙ্গদার অনুবাদ।

৫। Glimpses of Bengal Life—রজনীরঞ্জন সেন কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ছোট গল্পের অনুবাদ।

রবীন্দ্র ইংরেজী গ্রন্থ

১৯১৪

৬। The king of the Dark Chamber—(নাট্য); ক্ষিতিশ চন্দ্র সেন কর্তৃক 'রাজার' অনুবাদ।

৭। The Post Office—(নাটক)—দেবব্রত মুখার্জির 'ডাকঘরের' অনুবাদ।

৮। Sadhana—(প্রবন্ধ)—Harvard University'তে প্রদত্ত বক্তৃতা।

৯। One hundred Poems of Kabir (কবিতা)।

১৯১৫

১০। The Maharani of Arakan—(নাট্য)—George Calderon কর্তৃক লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি গল্পের নাটিকা রূপ।

১৯১৬

১১। Fruit Gathering : (কবিতা)। (গীতালি হ'তে ১৬টি; বলাকা হ'তে ১৪টি; উৎসর্গ হ'তে ৮টি; কথা হ'তে ৬টি; খেয়া হ'তে ৫টি; স্মরণ হ'তে ৫টি; চিত্রা হ'তে ২টি; নৈবেদ্য হ'তে ২টি; ধর্ম্মসঙ্গীত হ'তে ৩টি; কল্পনা, গীতাঞ্জলি, রাজা, মানসী, কড়ি ও কমল ও অচলায়তনের প্রত্যেকটি হ'তে এক একটি কবিতা এই পুস্তকে স্থান পেয়েছে।)

১২। Hungry Stones and other stories :—(ক্ষুধিত পাষাণ; জয়পরাজয়; অসম্ভব কথা; খোকার প্রত্যাবর্ত্তন; একটি আষাঢ়ে গল্প; বোষ্টমি; দৃষ্টিদান; ঠাকুর্দ্দা; জীবিত ও মৃত; রাজটীকা; ত্যাগ; কাবুলিয়ালা—গল্পের অনুবাদ।)

১৩। Stray Birds—(Epigrams)

১৯১৭

১৪। The Cycle of Spring—(নাট্য)—ফাল্গুনীর অনুবাদ।

১৫। My Reminescences :—জীবন স্মৃতির অনুবাদ।

১৬। Sacrifice and other Plays :—প্রকৃতির পরিশোধ; মালিনী; বিসর্জন; রাজা ও রাণীর সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।)

১৭। Personality—আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতা মালা।

১৮। Nationalism—প্রবন্ধমালা।

১৯। Selected Passages for Bengali Translation.

১৯১৮

২০। Gitanjali and Fruit-gathering : (কবিতা-সংগ্রহ)

২১। Lover's Gift and Crossing :—(কবিতা সংগ্রহ)। (বলাকার ১৪টি; খেয়ার ১০টি; গীতাঞ্জলির ৮টি; গীতিমাল্যের ৮টি; নৈবেদ্যের ৭টি; উৎসর্গের ৭টি; চিত্রার ৫টি; স্মরণের ৪টি; গীতালির ৪টি; চৈতালির ৪টি; কল্পনার ৪টি; মানসীর ২টি; প্রায়শ্চিত্তের ২টি; অচলায়তনের ৩টি; কড়ি ও কোমলের ১টি; কাহিনীর ১টি এবং প্রায় ৯টি ধর্ম্ম সঙ্গীত নিয়ে এই সংগ্রহ পুস্তক)।

২২। Mashi and other stories :—(শেষের রাত্রি; কঙ্কাল; শুভদৃষ্টি; একরাত্রি; সদর ও অন্দর; সম্পত্তি সমর্পণ; সমস্যা পূরণ; দিদি; শুভা; পোষ্ট মাষ্টার; ঘাটের কথা; আপদ উদ্ধার ও প্রতিবেশিনী'র অনুবাদ).

২৩। Stories from Tagore :—(কাবুলিয়ালা; ছুটি; অসম্ভব কথা; মাষ্টার মশাই; শুভা; পোষ্ট মাষ্টার; আপদ; রাসমণির ছেলে ও ঠাকুর্দ্দা'র অনুবাদ)

২৪। The Parrot's Training—(সবুজ পত্রে প্রকাশিত তোতাকাহিনীর অনুবাদ)

১৯১৯

২৫। The Centre of Indian Culture :—(প্রবন্ধ)।

২৬। The Home and the world—(সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক "ঘরে বাইরে" উপন্যাসের অনুবাদ)।

২৭। The Trial of the Horse.

১৯২১

২৮। Greater India—(প্রবন্ধ)

২৯। The Wreck—("নৌকাডুবি" উপন্যাসের অনুবাদ)

৩০। Poems from Tagore.

৩১। Glimpses of Bengal (সুরেন্দ্র নাথ ঠাকুরের ছিন্নপত্রের অনুবাদ)

৩২। Thought Relics.

৩৩। The Fugitive—(কবিতা)—লিপিকার প্রায় ২০টি; মানসীর ৬টি; সোনার তরীর ৭টি; চৈতালির ৭টি; চিত্রার ৫টি; ক্ষণিকার ৪টি; কাহিনীর ৪টি; পলাতকার ৪টি; উৎসর্গের ৩টি; বলাকার ৩টি; কড়ি ও কোমলের ২টি; স্মরণের ২টি; খেয়ার ১টি; গীতিমাল্যের ১টি; ও কথার ১টি কবিতা স্থান পেয়েছে।) বিদায় অভিশাপ; সতী; গান্ধারীর আবেদন; নরক বাস; কর্ণ-কুন্তী সংবাদ ও বৈষ্ণব সঙ্গীত; বাউল সঙ্গীত এবং জ্ঞানদাসের হিন্দী সঙ্গীতের অনুবাদও স্থান পেয়েছে।

১৯২২

৩৪। Creative Unity—প্রবন্ধ।

১৯২৪

৩৫। Letters from Abroad.

৩৬। Gora—W. W. Pearson'র গোরা উপন্যাসের অনুবাদ।

৩৭। The Curse at Farewall :—E. T. Thomson কর্তৃক কবিতায় অনূদিত বিদায় অভিশাপ)

১৯২৫

৩৮। Talks in China (প্রবন্ধ)।

৩৯। Poems :—(E. J. Thomson কর্তৃক অনূদিত প্রায় ২০টি কবিতার সংগ্রহ)

৪০। Red oleanders—"রক্ত করবীর" অনুবাদ।

৪১। Broken Ties and other stories : (চতুরঙ্গ; নিশিথে; স্বর্ণমৃগ; মেঘ ও রৌদ্র; মণিহার; পরিশোধ নামক কবিতা হ'তে গৃহীত।)

১৯২৬

৪২। The Meaning of Art.

১৯২৮

৪৩। Fireflies.

৪৪। Letters to a Friend.

৪৫। The Tagore Birthday Book .—C. F. Andrews সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী রচনা সংগ্রহ।

৪৬। Lectures and Addresses.

৪৭। A Poets' school.

১৯২৯

৪৮। Thoughts from Tagore :—C. F. Andrews সম্পাদিত।

৪৯। On Oriental Culture and Japan's Mission.

রবীন্দ্র ইংরেজী গ্রন্থ

১৯৩০

৫০। The Religion of Man—Hibbert Lecture.

১৯৩১

৫১। The Child—(গদ্য কাব্য)

১৯৩২

৫২। The Golden Boat :—ভবানী ভট্টাচার্য কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতার অনুবাদ।

৫৩। Mahatmaji and the Depressed Humanity

৫৪। Sheaves, Poems and Songs :—নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের অনুবাদ।

১৯৩৩

৫৫। Presidential Address : Rabindra Nath Tagore, Rammohan Roy Centenary, 18th Feb., 1933. রামমোহন রায় শতবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ।

১৯৩৪

৫৬। My ideals with regard to the Sree Bhaban.

১৯৩৫

৫৭। East and West : প্রবন্ধ।

৫৮। Twenty-six Songs of Tagore.

১৯৩৬

৫৯। Education Naturalized.

৬০। An Address : সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ উপলক্ষে ১৫ই জুলাই, ১৯৩৬ ; কলিকাতায় প্রতিবাদ সভায় রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা।

৬১। Collected Poems and Plays of Rabindranath Tagore.

১৯৩৭

৬২। Man—বক্তৃতা।

৬৩। China and India :—শান্তিনিকেতনে চীনাভবন উদ্বোধন উপলক্ষে বক্তৃতা।

৬৪। Religion of the Spirit and Sectarianism.

১৯৩৮

৬৫। My boyhood Days :—Marjori Sykes কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলার' অনুবাদ।

১৯৪২

৬৬। Poems.

১৯৪৩

৬৭। Muktadhara.

বিদেশী সাহিত্যে রবীন্দ্র গ্রন্থের অনুবাদ পরিচয়

Gitanjali

১।	সুইডিশ :	অনুবাদক	Andrea Butenschon (১৯১৩)
২।	ড্যানিশ :	"	Louis V Kohl (১৯১৩)
৩।	জার্মান :	"	Marie Louise Gothein (১৯১৪)
৪।	ফ্রেঞ্চ :	"	André Gide (১৯১৪)
৫।	ডাচ :	"	Frederic Van Ecden (১৯১৪)
৬।	ইতালীয় :	"	Arundel del Re (১৯১৪)
৭।	রাশিয়ান :	"	U. Balrushaitz (১৯১৪)
		"	N. A. Pusheshnikov (১৯১৪)
৮।	চেক :	"	F. Balej (১৯১৪)
৯।	স্প্যানিশ :	"	Zonobia Cambrubi de Jimenez (১৯১৯)
১০।	রাশিয়ান :	"	Alexey Smirnov (১৯১৯). (অস্কার ওয়াইল্ডের কবিতা ও রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি', 'গার্ডেনার', 'দি ক্রিসেণ্ট মুন', ও 'ফ্রুট গেদারিং' প্রভৃতির সংকলন পুস্তক।
১১।	যুগোশ্লাভ :	"	Dved S. Reyade (১৯২৬)
১২।	লাটভিয়ান :	"	Karla Egles (১৯৩০)
১৩।	এস্তোনিয়া :	"	Hugo Masing (১৯২৬)
১৪।	হিব্রু :	"	David Frishman

The Gardener (মালঞ্চ)

১। সুইডিশ : অনুবাদক Kr. Anderberg (১৯১৪)
২। ড্যানিশ : „ Louis V. Kohl (১৯১৪)
৩। জার্মান : „ Hans Effenberger (১৯১৪)
৪। ডাচ : „ Frederic Van Ecden (১৯১৪)
৫। ইড্ডিশ : „ Oscar Dubin (১৯১৫)
৬। চেক : „ F. Balej (১৯২৭)
৭। রাশিয়ান : „ A. E. Grusinskaya (১৯১৮)
৮। ফ্রেঞ্চ : „ Henriette Mira band-Thorens (১৯২০)
৯। স্প্যানিশ „ Antonio Figueirinhas (১৯২২)
১০। যুগোশ্লাভ „ David S. Riyade (১৯২৩)
১১। গ্রীক : „ Eyfes Lagopoiloi Apostiloi (১৯২৬)
১২। পোর্তুগীজ : „ Francisca de Basto Cordeiro
১৩। লাটভিয়ান : „ Karla Egles (১৯৩০) গ্রন্থাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড (১৯৩০)
১৪। এস্তোনিয়া : „ Hugo Masing.
১৫। হিব্রু : „ David Frishman.

The Crescent Moon

১। সুইডিশ : অনুবাদক Harold Heyman (১৯১৪)
২। রাশিয়ান : „ M. Likiardopulov (১৯১৪)
৩। জার্মান : „ Hans Effenberger (১৯১৫)
৪। স্প্যানিশ : „ Z. C. A. (১৯১৫)

৫। ড্যানিশ : প্রকাশক V. Pio's Boghandel, কোপেন-হাগেন (১৯১৮)

৬। চেক . অনুবাদকের নাম দেওয়া নেই। (১৯২০)

৭। ইতালীয় : অনুবাদক Clary Zannoni Chauvet (১৯২০)

৮। হাঙ্গারিয়ান : " Zsoldas Beno (১৯২২)

৯। ফ্রেঞ্চ : " Mme. Sturge Moore (১৯২৩)

১০। হিব্রু : " David Frishman

Chitra

১। জার্মান : অনুবাদক Elisabeth Wolff-Merck (১৯১৪)

২। পর্তুগীজ : " Jose F. Ferreira Martins (১৯১৪)

৩। ইতালীয় : " Ferd Verdinois (১৯১৬)

৪। স্প্যানিশ : " মাদ্রিদ সংস্করণ (১৯১৯)

৫। রাশিয়ান : " C. A. Adrianov (১৯২৯)

৬। লাটভিয়ান : গ্রন্থাবলী ৫ খণ্ড

৭। হাঙ্গারিয়ান : অনুবাদক Laky Dezso

৮। হিব্রু : " David Frishman

The King of the Dark Chamber

১। ইতালীয় : অনুবাদক Ferd. Verdinoes (১৯১৬)

২। সুইডিশ : " Kr. I Anderberg (১৯১৭)

৩। স্প্যানিশ : " মাদ্রিদ সংস্করণ (১৯১৯)

৪। চেক : " Dr. F. Balej ও Dr. V. Lesny (১৯২০)

৫। রাশিয়ান : " B. B. Gippius, D. H. Nosovitch (১৯২৩)

৬।	লাটভিয়ান	"	গ্রন্থাবলী ৫ খণ্ড ১৯২৯
৭।	জার্মান :	"	Hedwig Lachmann and Gustar Landaner

The Post Office

১।	সুইডিশ :	অনুবাদক	Hugo Hultenberg (১৯১৬)
২।	স্প্যানিশ :	"	মাদ্রিদ সংস্করণ (১৯১৭)
৩।	চেক :	"	Jarmel Krecar (১৯২১)
৪।	হাঙ্গারিয়ান :	"	Bartos Zoltan (১৯২২)
৫।	ফ্রেঞ্চ :	"	Andre Gide (১৯২৪)
৬।	লাটভিয়ান	"	Karla Egles (১৯২৭)
৭।	জার্মান :	"	Hedwig Lachmann and Gustar Landaner.
৮।	ডাচ :	"	Henry Borel.

Sadhana

১।	সুইডিশ :	অনুবাদক	Aug Carr (১৯১৪)
২।	রাশিয়ান :	"	V. Pogoskasky (১৯১৪)
৩।	ইতালীয় :	"	Aug Carelli (১৯১৫)
৪।	চেক :	"	F. Balej (১৯২০)
৫।	জার্মান :	"	Helene Meyer-Franck (১৯২১)
৬।	লাটভিয়ান :	"	গ্রন্থাবলী ৯ম খণ্ড—নূতন সংস্করণ (১৯৩৯)
৭।	ফ্রেঞ্চ :	"	Jean Herbert (১৯২০)

One Hundred Poems of Kabir

১।	ফ্রেঞ্চ :	অনুবাদক	Mme Meraband Thorens (১৯২২)

২। ইতালীয় : " Clary Zaunoni Chauvet (১৯২৩)

৩। স্প্যানিশ : " "en Castellano" (১৯২৪)

Fruit Gathering

১। সুইডিশ : অনুবাদক Hugo Hultenberg (১৯১৬)

২। ইতালীয় : " E. Tag lialatela (১৯১৭)

৩। জার্মান : " Annemarie V. Putikammer (১৯১৮)

৪। স্প্যানিশ : মাদ্রিদ সংস্করণ (১৯১৮)

৫। ফ্রেঞ্চ : অনুবাদক Helene de Pasqurier (১৯২১)

৬। ড্যানিশ : " Ingeborg Seedorff (১৯২৩)

৭। চেক : " L. Vojtig (১৯২৩)

৮। লাটভিয়ান : " Karla Egles সম্পাদিত গ্রন্থাবলী (৬ষ্ঠ খণ্ড)

৯। হিব্রু : " David Frishman.

Hungry Stones

১। সুইডিশ : অনুবাদক Harald Heyman, ১৯১৮

২। স্প্যানিশ : মাদ্রিদ সংস্করণ (১৯১৮)

৩। জার্মান : অনুবাদক Annemarie V. Putikammer

Broken Ties

১। ফ্রেঞ্চ : অনুবাদক Madeleine Rolland (১৯২৫)

২। রাশিয়ান : " E. S. Khakhlova (১৯২৫)

৩। বুলগেরিয়ান : " K. Konstantinov, (১৯২৬)

Balaka

১। ফ্রেঞ্চ: অনুবাদক Kalidas Nag ও Peirre-Jean Jouve (১৯২৩)

Straybirds

১। সুইডিশ: অনুবাদক Hugo Hultenberg (১৯১৭)
২। ড্যানিশ: „ Kai Friis-Moller (১৯১৭)
৩। স্প্যানিশ: মাদ্রিদ সংস্করণ (১৯১৭)
৪। জার্মান: গ্রন্থাবলী ৮ম খণ্ড (১৯২১)
৫। হাঙ্গারিয়ান: অনুবাদক Zsoldos Beno (১৯২২)
৬। লাটভিয়ান: গ্রন্থাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৯৩০ ; ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে Stray-birds ও The Golden Boat একত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত।

My Reminiscences

১। সুইডিশ: অনুবাদক Aug. Carr (১৯১৯)
২। ড্যানিশ: „ E. Menon (১৯২২)
৩। জার্মান: „ Helene Meyer-Franck (১৯২৩)
৪। ফ্রেঞ্চ: „ E. Pieczynska.
৫। রাশিয়ান „ M. I. Tubiansky (১৯২৪)

Sacrifice & Other Plays

১। স্প্যানিশ: অনুবাদক মাদ্রিদ সংস্করণ
২। সুইডিশ: „ Hugo Hultenberg (১৯১৯)
৩। রাশিয়ান: „ C. A. Andrianov (১৯২২)
৪। লাটভিয়ান: গ্রন্থাবলী, ৫ম খণ্ড ১৯২৯
৫। জার্মান: গ্রন্থাবলী, ৩য় খণ্ড (১৯২১)

বিদেশী সাহিত্যে রবীন্দ্র গ্রন্থের অনুবাদ পরিচয়

Cycle of Spring

১। স্প্যানিশ : অনুবাদক মাদ্রিদ সংস্করণ (১৯১৮)

২। ফ্রেঞ্চ : Henriette Miraband—Thorens (১৯২৬)

Personality

১। সুইডিশ : অনুবাদক August Carr ১৯২০

২। জার্মান : গ্রন্থাবলী ৭ম খণ্ড

৩। রাশিয়ান : অনুবাদক J. A. Kolubovsky (১৯২২)

Nationalism

১। জার্মান : অনুবাদক Helene Meyer Franck (১৯১৮)

২। চেক : " K. Skrachovi (১৯২১)

৩। রাশিয়ান : " I. A. Kolubovsky & M. J. Toobiansky (১৯২২)

৪। ফ্রেঞ্চ : " Cecil George-Bazile (১৯২৪)

Lover's Gift & Crossing

১। স্প্যানিশ : মাদ্রিদ সংস্করণ (১৯১৯, ১৯২০)

২। ড্যানিশ : অনুবাদক Valdemar Rordam, V. Rio's Boghandel (১৯২০)

৩। সুইডিশ : Hugs Hultenberg (১৯২১)

৪। জার্মান : গ্রন্থাবলী ২য় খণ্ড (১৯২১)

৫। হাঙ্গারিয়ান : প্যান্থিয়ন সংস্করণ ১৯২২

৬। লাটভিয়ান : গ্রন্থাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড (১৯৩০) ও পরবর্ত্তী সংস্করণ (১৯৩৭)

Mashi & Other Stories

১। স্প্যানিশ : ১ম খণ্ড, মাদ্রিদ সংস্করণ (১৯২০), ২য় খণ্ড মাদ্রিদ সংস্করণ (১৯২১)

২। জার্মান : গ্রন্থাবলী ৪র্থ খণ্ড (১৯২১)

৩। হাঙ্গারিয়ান : অনুবাদক Sarmay Marton (১৯২২)

৪। ফ্রেঞ্চ : „ Helene die Pasqrier, (১৯২৫)

৫। লাটভিয়ান : „ গ্রন্থাবলী ৭ম খণ্ড এবং পরবর্ত্তী সংস্করণে দুই খণ্ডে সমস্ত গল্প সংগ্রহ করে প্রকাশিত (১৯৩৭)

৬। ডাচ : „ Door B. Ehawab (১৯৩৬)

৭। ইতালীয় : „ Vestri Georgi

৮। রাশিয়ান ; „ G. E. Gordon (তিনটি মাত্র গল্প)

The Parrot's Training

১। ডাচ ; অনুবাদক Noto Socroto (১৯২২)

২। হাঙ্গারিয়ান ; „ Bartoo Zotton (১৯২২)

The Home and the World

১। জার্মান ; অনুবাদক Helene Meyer Franck (১৯২০)

২। ড্যানিশ ; প্রকাশক Pio's Boghandel (১৯২০)

৩। চেক ; অনুবাদক Ant. Klastersky (১৯২১)

৪। ফ্রেঞ্চ ; „ Frederick-Roger Cornez (১৯২১)

৫। সার্বিয়ান ; „ Leter Beshevitch (১৯২৬)

৬। লাটভিয়ান ; „ গ্রন্থাবলী ৫ম খণ্ড (১৯২৮) ; পরবর্ত্তী সংস্করণ (১৯৩৮)

৭। হিব্রু ; „ David Frishman

বিদেশী সাহিত্যে রবীন্দ্র গ্রন্থের অনুবাদ পরিচয়

The Fugitive

১। স্প্যানিশ ; মাদ্রিদ সংস্করণ (২ খণ্ডে) (১৯২২)

২। ফ্রেঞ্চ ; অনুবাদক Renee de Brumont (১৯২২)

৩। লাটভিয়ান ; গ্রন্থাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড (১৯৩০)

Glimpses of Bengal

১। চেক ; অনুবাদক L. Vojtig, ১৯২২

২। রাশিয়ান ; „ Joseph Tchervonsky (১৯২৭)

The Wreck

১। জার্মান ; গ্রন্থাবলী, ৫ম খণ্ড (১৯২১)

২। লাটভিয়ান ; গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড (১৯২৭)

৩। ফ্রেঞ্চ ; অনুবাদক Henriette Miraband-Thorens (১৯২৯)

৪। হিব্রু : „ Unreil Halperln

Lipika

১। জার্মান ; অনুবাদক Reinhard Wagner (১৯২৬)

Creative Unity

১। ফ্রেঞ্চ ; অনুবাদক A Tougard de Boismelon (১৯২৩)

Muktadhara

১। ফ্রেঞ্চ ; অনুবাদক Benoit and Amiya Chandra Chackravarty (১৯২৯)

Gora

১। রাশিয়ান ; অনুবাদক E. K. Pemonov (১৯২৪)

২। হাঙ্গারিয়ান ; „ Kelen Ferenc (১৯২৫)

৩। লাটভিয়ান ; গ্রন্থাবলী ৩য় খণ্ড (২ খণ্ডে) (১৯২৮)

Fireflies

১। সুইডিশ ; অনুবাদক Prince Welhelm (১৯২৭)

২। ফ্রেঞ্চ ; Fenilles de L'Inde কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৩০)

Letters to a Friend

১। ফ্রেঞ্চ ; অনুবাদক Jane Doz-Vigrie (১৯৩১)

২। স্প্যানিশ ; „ Dr. Nicolas Ma Martinez Amador (১৯৩১)

The Religion of Man

১। স্প্যানিশ ; অনুবাদক R. Cansinos Arsens (১৯৩১)

২। সুইডিশ ; „ Hugo Hultenberg (১৯৩২)

৩। ফ্রেঞ্চ ; „ Jane Droz Vignie (১৯৩৩)

বিদেশী ভাষায় রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী

১। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বার্লিন থেকে Kurt Wolff Verlag কর্তৃক রবীন্দ্র গ্রন্থের একটি সম্পূর্ণ অনুবাদ জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়। ৮টি খণ্ডে এই গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ।

১। কবিতা; ২। কবিতা; ৩। নাটক; ৪। গল্প; ৫। The wreck; ৬। The Home and the world; ৭। Sadhana-Nationalism; ৮। Personality, Straybirds, Lectures and General introduction to Rabindranath.

২। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৯'র মধ্যে Riga থেকে রবীন্দ্র গ্রন্থের একটি সম্পূর্ণ অনুবাদ লাটভিয়ান ভাষায় প্রকাশিত হয়। Karla Egles কর্তৃক অনূদিত ও টিকাকৃত দশ খণ্ডে এই গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ।

১। Rabindra Nath's life and work including bibliography and chronology.

২। নৌকাডুবি; ৩। (ক) গোরা; (খ) গোরা; ৪। ঘরে বাইরে; ৫। নাটক; ৬। কবিতা; (৭) দুষ্প্রাপ্য; (৮) গল্প; (৯) সাধনা।

রবীন্দ্র পরিচয় বাংলা গ্রন্থমালা

[সেক্সপীয়রের রচনাকে কেন্দ্র করে যে সেক্সপিরীয়ান সাহিত্য গড়ে উঠেছে মূল সাহিত্যের তুলনায় তার মূল্য যেমন কম নয় তেমনি রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করেও যে রবীন্দ্রসাহিত্য ক্রমশঃ সৃষ্টি হচ্চে বাংলা সাহিত্যে একদিন তারও স্থান অমূল্য হয়ে উঠবে নিজস্ব ঐশ্বর্য ও উৎকর্ষতায়। বাংলায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে সব পুস্তক লিখিত হয়েছে আমরা তার একটি তালিকা এখানে লিপিবদ্ধ করেছি। অবশ্য এ সংগ্রহ সম্পূর্ণ নয় এবং কোন সময়েই সম্পূর্ণ হ'তে পারে না।]

অজিত কুমার চক্রবর্ত্তী	রবীন্দ্রনাথ
"	কাব্য পরিক্রমা
অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর	আমাদের বিশ্বকবি
ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	কবি রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব
উপেন্দ্র কুমার কর	গীতাঞ্জলির সমালোচনা
কাজী আবদুল ওদুদ	রবীন্দ্র কাব্য পাঠ
কানন বিহারী মুখোপাধ্যায়	মানুষ রবীন্দ্রনাথ
কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত	গীতাঞ্জলির ভাবধারা
গৃহস্থ	রবীন্দ্রসাহিত্যে ভারতের বাণী
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	রবিরশ্মি (১ম ও ২য় খণ্ড)
দক্ষিণারঞ্জন বসু	শতাব্দীর সূর্য
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত	কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ
নিহার রঞ্জন রায়	রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা (১ম ও ২য় খণ্ড)

রবীন্দ্র পরিচয় বাংলা গ্রন্থমালা

প্রতিমা ঠাকুর	নির্বাণ
প্রবোধ চন্দ্র সেন	ছন্দ গুরু রবীন্দ্রনাথ
প্রমথনাথ বিশী	রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ
,,	রবীন্দ্রনাথ ও শান্তি নিকেতন
,,	রবীন্দ্র কাব্য নির্ঝর
প্রফুল্ল কুমার সরকার	জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ
প্রফুল্ল কুমার বসু	রবিদাদা
প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়	রবীন্দ্রজীবনী (১ম ও ২য় খণ্ড)
,,	রবীন্দ্র বর্ষ পঞ্জী
,,	রবীন্দ্র গ্রন্থ পঞ্জী
প্রেসিডেন্সী কলেজ রবীন্দ্র পরিচয় সভা	কবি পরিচিতি
বিজন ভট্টাচার্য	প্রভাত রবি
বিজয় লাল চট্টপাধ্যায়	রবীন্দ্র সাহিত্যে পল্লীশ্রী
,,	রিয়ালিষ্ট রবীন্দ্রনাথ
বিনয় কুমার সরকার	রবীন্দ্র সাহিত্যে ভারতের বাণী
বিমল ঘোষ	শিশু রবি
বিশ্বপতি চৌধুরী	কাব্যে রবীন্দ্রনাথ
বিশ্বভারতী	রোঁলা ও ঠাকুর
বুদ্ধদেব বসু	সব পেয়েছির দেশ
ব্রজেন্দ্রনাথ দত্ত	রবীন্দ্র সাহিত্য
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন্দ্রগ্রন্থ পরিচয়
ভরত চন্দ্র মজুমদার	জাতি গঠনে রবীন্দ্রনাথ
ভোলানাথ সেন	রক্তকরবীর মর্ম্মকথা

বাহির বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ

মৌলবী একরামদ্দীন	রবীন্দ্রপ্রতিভা
শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী	মংপুতে রবীন্দ্রনাথ
,, রেণু মিত্র	রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে
যামিনীকান্ত সোম	ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ
রাণী চন্দ	আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ
রাণী চন্দ ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ঘরোয়া
রবীন্দ্র পরিষদ	কবি পরিচয়
রবীন্দ্র পরিচয় সভা	জয়ন্তী উৎসর্গ
রবীন্দ্র-জয়ন্তী ছাত্রছাত্রী উৎসব পরিষদ	কবি প্রশস্তি
শচীন্দ্রনাথ অধিকারী	পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ
,,	সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ
শিবকৃষ্ণ দত্ত	রবীন্দ্রসাধনা
শচীন সেন	রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিচয়
শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্ত ভাদুড়ী	বাহির বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ
সরসীলাল সরকার	রবীন্দ্র কাব্যে ত্রয়ী পরিকল্পনা
সুবোধ সেনগুপ্ত	রবীন্দ্রনাথ
সুবোধ দাসগুপ্ত	রবিদীপিতা